গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ১৮ সংখ্যা ৩১ ডিসেম্বর ২০০৪ - ৬ জানুয়ারি ২০০৫ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

এ আই ডি এস ও'র ৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবসে বিশাল ছাত্রসমাবেশ

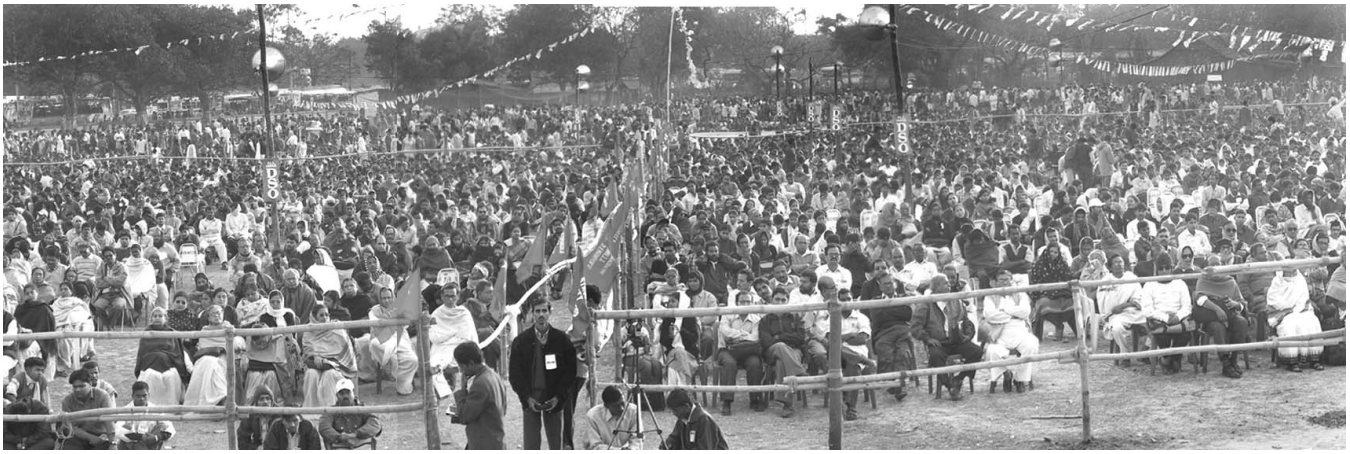

এ আই ডি এস ও'র ৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে বিশাল ছাত্রসমাবেশের একাংশ। আরও ছবি আটের পাতায় (বিস্তারিত সংবাদ আগামী সংখ্যায়)

বন্‌ধ ঃ বিধানসভায় এস ইউ সি আই-এর প্রস্তাব সিপিএম খারিজ করে দিল

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বন্‌ধকে সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল থেকে পৃথক করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল করা চলতে পারে, কিন্তু বন্‌ধ নিষিদ্ধ। এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতেই কলকাতা হাইকোর্ট ১৭ নভেম্বর এস ইউ সি আই-এর ডাকা বন্‌ধকে বেআইনি ঘোষণা করে। এইভাবে একদিকে রাজনৈতিক মিটিং-মিছিলের অধিকারকে নানা নিয়ম-কানুনের বেড়াজালে আটকে ফেলে ও অন্যদিকে বন্‌ধকে সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল থেকে আলাদা করে জনমনে প্রবল বিভ্রান্তি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে জনগণের আন্দোলনের অধিকারকেই শাসকশ্রেণী কেড়ে নিতে চাইছে।

এ ব্যাপারে সি পি এম নেতৃত্ব কিছুদিন 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' অবস্থান নিয়ে চলার পর, হঠাৎ ঘোষণা করলেন যে, জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অধিকার রক্ষার জন্য সি পি এম পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় একটি সর্বদলীয় প্রস্তাব আনতে চায়। ঐ প্রস্তাবের খসড়া পাওয়া গেলে দেখা গেল, ঐ প্রস্তাবে বন্‌ধ সম্পর্কে একটি শব্দও নেই, ধর্মঘট করার অধিকারই ঐ প্রস্তাবের মূল কথা। 'সাধারণ ধর্মঘট' ও 'হরতাল' থেকে 'বন্‌ধ'-কে পৃথক দেখিয়ে আন্দোলনের এই গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারকে যখন কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে, তখন বিধানসভার প্রস্তাবে সেই বন্‌ধ সম্পর্কে কোনও উল্লেখ না থাকলে মূল প্রশ্নকেই কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয় এবং আন্দোলনের বিরুদ্ধে শাসকশ্রেণীর পরিকল্পনাতেই মদত জোগানো হয়। সি পি এম-এর উত্থাপিত প্রস্তাবে ঠিক এই কাজটিই করা হয়েছে। এজন্যই এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে একটি ভিন্ন প্রস্তাব বিবেচনার জন্য বিধানসভায় পেশ করা হয়। বলা বাহুল্য, ১৭

সাতের পাতায় দেখুন

সরকার কি সত্যিই অনলাইন লটারির বিরুদ্ধে

ধারাবাহিক আন্দোলনের চাপে অবশেষে রাজ্য সরকার বাধ্য হল অনলাইন লটারি সেন্টারগুলির বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান চালাতে। অনলাইন লটারি নামক জুয়া যেভাবে গোটা রাজ্যজুড়ে মারাত্মক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে তাতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষমাত্রই আতঙ্কিত। প্রতিদিন হাজার হাজার বেকার যুবক, গরিব খেটে খাওয়া মানুষ, এমনকী ছাত্রছাত্রীরা পর্যন্ত এই খেলায় জড়িয়ে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে। সর্বস্ব খুইয়ে আত্মহত্যার ঘটনাও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এ নিয়ে ক্ষোভও ক্রমাগত বাড়ছে। বিক্ষুব্ধ মানুষ বহু জায়গায় বিক্ষোভ দেখিয়ে অনলাইন সেন্টার বন্ধ করে দিয়েছে, কোথাও কোথাও মেসিন ভেঙে দিয়েছে। এস ইউ সি আই দলের ডাকা বাংলা বন্‌ধের অন্যতম দাবি ছিল অনলাইন লটারি বন্ধ করা। এদিকে দলের গণসংগঠন ডি ওয়াই ও, ডি এস ও এবং এম এস এসের পক্ষ থেকে অনলাইন লটারি বন্ধ করার দাবিতে লাগাতার প্রচার এবং বিক্ষোভ-আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছে। কলকাতা সহ রাজ্যের জেলায় জেলায় বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে, থানায় ডেপুটেশন, স্বাক্ষর সংগ্রহ, পথসভা, বিক্ষোভ এবং মিছিল সংগঠিত করার পর ডি ওয়াই ও গত ২০ ডিসেম্বর যুব বিক্ষোভ ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দিয়ে অনলাইন লটারি বন্ধের দাবি জানিয়েছে। এস ইউ সি আই পরিষদীয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার গত ১৭ ডিসেম্বর বিধানসভায় অনলাইন লটারি বন্ধ করার দাবিতে একটি মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিধানসভায় এবং বিধানসভার বাইরে এস ইউ সি আই দলের এই আন্দোলন সরকারের উপর কার্যকরী চাপ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। অন্যদিকে সি পি এম দলের মুখপত্র গণশক্তিতে অনলাইনের ধারাবাহিক বিজ্ঞাপন সে দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে বহু প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। সি পি এম ছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির নিচুতলার কর্মী-সমর্থকরাও এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। এইরকম একটি পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার বাধ্য হয়ে অনলাইন সেন্টারগুলিতে পুলিশি অভিযান শুরু করে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত মানুষের সাহায্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতা চাই — নীহার মুখার্জী

তীব্র ভূকম্পন ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ফলে, প্রধানত দেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংসলীলা এবং হাজার হাজার মানুষের আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর ব্যথা ও শোক প্রকাশ করে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ২৬ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে অবিলম্বে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার ও ত্রাণকার্য শুরু করা এবং ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত মানুষের যন্ত্রণা উপশমের যাবতীয় ব্যবস্থা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য কেন্দ্রীয় ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির নিকট আবেদন জানিয়েছেন।

সেই সঙ্গে ভূমিকম্প ও জলোচ্ছ্বাসে বিধ্বস্ত মানুষের প্রতি সর্বপ্রকার সাহায্যের অকৃপণ হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য দেশের জনগণের প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

বিধ্বস্ত তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে এবং কেরালার সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত কুইলন ও আলেপ্পি জেলায় এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগে সমস্ত গণফ্রন্টের কর্মীদের যুক্ত করে জনসাধারণের সাহায্য ও সহায়তায় দুর্গত এলাকায় সর্বশক্তি নিয়ে ত্রাণকার্য শুরু হয়েছে।

বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা নৃপেন চক্রবর্তীর মৃত্যুতে কমরেড নীহার মুখার্জীর শোকপ্রকাশ

সি পি আই (এম)-এর প্রবীণ নেতা ও ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর জীবনাবসানে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ২৫ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছেন, নৃপেন চক্রবর্তী তাঁর দীর্ঘ জীবনকালে ভারতের বামপন্থী আন্দোলনের বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত সিপিএম নেতা ও কর্মীদের প্রতি কমরেড মুখার্জী আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।

কলকাতায় সিপিএম কার্যালয়ে প্রয়াত নৃপেন চক্রবর্তীর মরদেহে কমরেড নীহার মুখার্জীর পক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য।

ছাত্র-যুব বিক্ষোভে অশ্লীল সিনেমা বন্ধ

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণ বারাসতে জোড়াপোলের পাশে শ্রীদুর্গা সিনেমা হলে নিয়মিত অশ্লীল সিনেমা প্রদর্শনের বিরুদ্ধে কমরেড দিব্যেন্দু মুখার্জীর নেতৃত্বে ডি ওয়াই ও এবং ডি এস ও কর্মীরা প্রবল বিক্ষোভ দেখায় এবং কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেয়। কর্তৃপক্ষ চলতি সিনেমাটি বন্ধ করার এবং ভবিষ্যতে ঐ ধরনের অশ্লীল সিনেমা না দেখানোর প্রতিশ্রুতি দেন।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পচা চাল ঃ ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের বিডিও দপ্তরে বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম ১নং ব্লকে বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পচা দুর্গন্ধযুক্ত চাল ও পোকালাগা ডাল শিশু পড়ুয়া ও প্রসূতি মায়েদের জন্য সরবরাহ করা হয়। এই খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কায় এলাকার মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এদিকে ব্লকের ২৪টি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর প্রায় ৫ হাজার ছাত্রছাত্রী গত ছয় মাস ধরে মিড-ডে মিল পাচ্ছে না। এই সমস্যাগুলি নিয়ে এস ইউ সি আই নন্দীগ্রাম লোকাল কমিটি গত ১৬ ডিসেম্বর নন্দীগ্রাম ১নং বিডিও দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায়। শত শত গ্রামবাসী পচা চাল ও পোকাধরা ডালের নমুনা বিডিও'র সামনে তুলে ধরেন। চাল-ডাল যে নিম্নমানের, একথা স্বীকার করে নিয়ে বিডিও বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

মদের ঢালাও লাইসেন্সের বিরুদ্ধে ছাত্র-যুব-মহিলাদের প্রতিবাদ

সারা ভারত ডি এস ও, এম এস এস এবং ডি ওয়াই ও'র যৌথ উদ্যোগে গত ১৫ ডিসেম্বর কোচবিহার জেলা অস্তঃশুল্ক অফিসারের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, সরকার রাজস্ববৃদ্ধির নামে গ্রামে-শহরে যথেচ্ছ মদের লাইসেন্স, সফ্‌ট ড্রিংকসের মোড়কে মদের প্রকাশ্য বিক্রির অনুমতি দিয়ে ছাত্র-যুব সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার সর্বনাশা চক্রান্ত করে চলেছে। এসবের পরিণতিতে নারী নির্যাতনের ঘটনা আরো বাড়বে এবং বিঘ্নিত হবে নারী সমাজের নিরাপত্তা। তাঁরা অবিলম্বে সরকারের এই সিদ্ধান্ত বাতিল করার দাবি জানান। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেড মমতাজ খাতুন, কৃষ্ণকান্ত বর্মণ এবং রীণা ঘোষ।

কলেজে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি

কোচবিহার বি টি এন্ড ইভনিং কলেজে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা ও শহরের সমস্ত কলেজে সমস্ত ছাত্রদের মত প্রকাশ করার অধিকার ফিরিয়ে আনার দাবিতে এ আই ডি এস ও'র কুচবিহার শহর কমিটির পক্ষ থেকে মহকুমা শাসকের (সদর) নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে ডি এস ও কোচবিহার শহর ইউনিটের পক্ষে স্বপন ইশোর বলেন, কলেজে কলেজে যারা ছাত্র সংসদ দখল করে আছে, তারা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য গণতান্ত্রিক পরিবেশকে গলা টিপে হত্যা করছে। এর বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

শিশুশিক্ষা সহায়িকা-সহায়কদের মহতী কনভেনশন

বহরমপুর রবীন্দ্র ভবনে শিশুশিক্ষা সহায়িকা-সহায়কদের এক প্রাণবন্ত কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় ২২ ডিসেম্বর। জেলার ২৬টি ব্লক থেকে আসা সহস্রাধিক চল্লিশোর্ধ্ব মহিলা-পুরুষ প্রতিনিধি তাদের বঞ্চনা-অবমাননা-অনটনের কথাই নয় — সুষ্ঠুভাবে মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার জন্য যথাসময়ে সাম্মানিক ভাতা, স্থায়ী নিয়োগপত্র, স্কুলঘর, অনাথদের বইপত্র, মিড-ডে মিল ইত্যাদি বারো দফা দাবি নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন এবং ঐক্য গড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

হরিহরপাড়া ব্লকের সামসের আলি জানান, 'তাঁদের মাসিক সম্মিলিত সভা এবং প্রশিক্ষণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের ঘরটিও ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। বাধ্য হয়েই মাঠেঘাটে প্রশিক্ষণ চালাতে হয়।' কান্দী ব্লকের অসীমা ঘোষ জানান, নয় মাস হয়ে গেল, এ পর্যন্ত তিনি সাম্মানিক ভাতাও পাননি। নবগ্রামের কল্যাণী দাস দারিদ্র্যের কারণে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন। জেলাতে এভাবেই মারা গেছেন অনেকেই। এ জেলায় ২৩৪২টি শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের প্রায় ৬৩৫০ জন সহায়ক-সহায়িকা সামান্য ভাতা (১০০০ টাকার) বিনিময়ে শিক্ষাদানের মতো কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাতে কখনও পনের মাস কখনও ন' মাস ভাতা পান না। কনটিনজেন্সির মত অন্যান্য খরচও সরকার জোগান দিতে চায় না বলে সংগঠনের সম্পাদিকা গুল সানোয়ারা ইভা জানান। দুঃখের কথা, সামান্য এই টাকা হাতে পেতে নানা ঘুরপথে নানা বখরাও মেটাতে হয়।

কনভেনশনে সহমর্মিতা জ্ঞাপন করে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়) -এর পক্ষ থেকে সুগত বিশ্বাস বলেন, সর্বত্র ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ করা হচ্ছে। শিশুশিক্ষা সহায়িকা-সহায়করা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে গেলে তাঁদের সংগঠনের সংগ্রামী হাত সর্বদা তাঁদের পাশে থাকবে। বিপিটিএ-এর পক্ষ থেকে আব্দুস সালাম দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সহায়ক-সহায়িকা থেকে ডিপিইপি, সর্বশিক্ষার নাম করে প্যারাটিচার নিয়োগের মাধ্যমে আসলে শিক্ষাসংহার অভিযান চলছে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে জয় ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভব। সংগঠনের সভানেত্রী অন্নপূর্ণা মণ্ডল এদিনের কনভেনশনকে ঐতিহাসিক বলে দাবি করেন। আগামী দিনে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়। দাবি সনদ নিয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে ব্লকে ব্লকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার কর্মসূচিও ঘোষিত হয়।

হাসপাতালের অব্যবস্থা ও দুর্নীতির প্রতিবাদে আন্দোলন

বীরভূম জেলার সিউড়ি ২নং ব্লকের সুলতানপুর (অবিনাশপুর) সরকারি হাসপাতালটি এলাকার জনগণের চিকিৎসার একমাত্র জায়গা। অথচ এই হাসপাতালটিতে প্রয়োজনীয় ওষুধ নেই, কুকুরে কামড়ানো-সাপে কাটার সিরাম নেই। সর্বোপরি এই হাসপাতালের বি এম ও এইচ নিজের কোয়ার্টারে ফি নিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

ডাক্তারের অপসারণ ও হাসপাতালের উন্নয়নের দাবিতে গত ১ অক্টোবর জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং সি এম ও এইচ-এর কাছে গণস্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি নিয়ে এস ইউ সি আই এবং হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি মিছিল করে ডেপুটেশন দেয়।

গত ৩ অক্টোবর ঐ ডাক্তার তাঁর কোয়ার্টারে এক মহিলার উপর ভুল অস্ত্রোপচার করেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন কয়েকশত মানুষ হাসপাতালে প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ঐ ডাক্তারের অপসারণ দাবি করে। ৪ নভেম্বর পুনরায় সি এম ও এইচ-এর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ৮ ডিসেম্বর হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি এবং এস ইউ সি আই আহূত এক বিক্ষোভ জমায়েতে বক্তব্য রাখেন দলের জেলা কমিটির সদস্যা কমরেড অনিতা মুখার্জী ও সিউড়ি ২নং ব্লক হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষে নবকুমার দাস। বিক্ষোভের চাপে সি এম ও এইচ ঐ ডাক্তারকে অপসারণের আশ্বাস দেন।

ডেবরায় গ্রাহকেরা বিদ্যুতের দাবি আদায় করল

অ্যাবেকা'র মেদিনীপুর জেলা কমিটির নেতৃত্বে ১৩ আগস্ট কয়েক শত বিদ্যুৎগ্রাহক বিদ্যুৎ পর্ষদের ডেবরা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার-এর অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এক সপ্তাহ আগে বিদ্যুৎ পর্ষদ পিংলা থানার জশোরাজপুর এলাকায় ৫টি গ্রামের বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেয়। বহু চাষীর চাষের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তারই প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ আন্দোলন। ২ ঘণ্টা ঘেরাও থাকার পরে এ ই কর্মচারীদের লাইন জুড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। আন্দোলনের এই জয় গ্রাহকদের উৎসাহিত করে।

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সভা

সারা বাংলা বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতির আহ্বানে গত ১২ ডিসেম্বর মেদিনীপুর শহরে এক সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রত্নাকর ঘোষ। উপস্থিত গ্রাহকদের মধ্যে অনেকেই বিদ্যুতের দামবৃদ্ধির চাপ এবং পর্ষদ কর্মচারীদের নানাপ্রকার হয়রানির অভিযোগ তুলে ধরেন।

সভায় মূল বক্তা অমল মাইতি বলেন, সম্প্রতি একের পর এক আন্দোলনের চাপে অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি, ইলেকট্রনিক মিটারের ভাড়া, ফিক্সড চার্জ, সরকারি ডিউটি কিছুটা কমেছে। তাই আন্দোলন করলে ফল পাওয়া যায়, এটা প্রমাণিত। পর্ষদ ষড়যন্ত্র করছে, 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩'কে হাতিয়ার করে আগামী মার্চ মাসের মধ্যে আরও ৩৭৩ কোটি টাকা মূল্যবৃদ্ধি ঘটাবে এবং এপ্রিল ২০০০ থেকে বাড়তি চার্জ 'বকেয়া' হিসাবে আদায় করবে। এই জুলুমের বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিতে হবে। সভায় এছাড়া বক্তব্য রাখেন অশ্বিনী সেন, প্রণব বসু, পঞ্চানন প্রধান, অর্জুন কুণ্ডু, তপন দাস, শ্যামল দাস প্রমুখ।

বন্‌ধ ঃ জনমত

গত ৮ এবং ১৬ ডিসেম্বর 'সংবাদ প্রতিদিন' পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি চিঠি প্রকাশ করা হল ঃ

হিন্দমোটর শ্রমিকরা দুর্দশায়

আপনাদের পত্রিকায় বন্‌ধ নিয়ে লেখা পড়লাম। লেখাটি সময়োপযোগী। কিন্তু বিচারকদের কিছু বিচারপদ্ধতি দেখে তাঁরা নিরপেক্ষ কি না, প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়। আমি হিন্দ মোটর কারখানার কর্মী। আমাদের ম্যানেজমেন্ট অন্যায়ভাবে ২০০১ সালের মার্চের পর থেকে ডি এ (ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স) বন্ধ করে রেখেছে। এতে আমাদের বেতন স্থির অবস্থায় আছে। কিন্তু জিনিসের দাম প্রচুর বেড়েছে। আমাদের সংসার চালানো মুশকিল হয়ে পড়েছে। তাই আমরা কোর্টে বিচার প্রার্থনা করি। কিন্তু কারও সময় নেই আমাদের কথা শোনার। প্রায় চার বছর অতিক্রান্ত, কিন্তু রায় হচ্ছে না। অথচ কোনও বিচারক যদি পথে মিছিলে আটকা পড়েন, তবে উনি সঙ্গে সঙ্গে মিছিল বন্ধের রায় দেন। অথচ রায়ের অপেক্ষায় হিন্দ মোটরের শ্রমিকরা খুব দুর্দশার মধ্যে পড়ে আছেন। এরপর প্রশ্ন, বিচারক কি প্রশাসন বা মালিক পক্ষের লোক ?

শ্যামল মুখোপাধ্যায়
(হিন্দ মোটর কারখানার কর্মী)

যা আইন, তাই কি মানবিক

বন্‌ধে গরহাজির কর্মীদের বেতন কাটার আইনি এবং প্রশাসনিক জবরদস্তির তোড়জোড় সত্ত্বেও, হাইকোর্টের খিলান-দরজার নিস্তব্ধ খোলা ছবি, মূল্যবৃদ্ধির দুর্ভার প্রকোপে পাথর-চাপা জনজীবনের শেকলতোড়া দীর্ঘশ্বাস যেন নিঃসীম শূন্যতায় নিঃশূন্য ঘা মারে। প্রশ্ন তোলে, বিচারের বেয়াদপি যদি নাই-ই হয়, তবে বন্‌ধকে বানচাল করতে অস্ত্র-উগ্র হুকুমের হুমকিতে বেতন কাটার ফরমান জারি কেন ? যাঁরা বন্‌ধ ডাকেন তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসন ও আইন যত তৎপর, ধিক তার তিলেক তৎপরতায় যাঁরা নিঝুম রাতে দুম করে পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়িয়ে বাড়িয়ে চলেন, যাঁরা দফায় দফায় মাসে মাসে গ্যাসের দাম বাড়ানোর স্পর্ধা জানান, তাঁদের বিরুদ্ধে কোথায় হাকিম, কোথায় হুকুম, কোথায় হুমকি ? মানুষকে বাঁয়ে-ডাইনে মিলে নিঙড়ে যাবে আর মানুষ রুখে দাঁড়ালেই দেশের আইন প্রশাসন একরোখা হয়ে ডাণ্ডা দিয়ে ঠাণ্ডা করে যাবে — এ যদি গণতন্ত্র হয়, তবে স্বৈরতন্ত্র কারে কয় ? মানুষ সংগ্রামশীল, ভুতুম প্যাঁচা নয়। সে ইতিহাসের শিল্পী, তাই তাকে স্বৈরতন্ত্রের মোকাবিলায় সমাজতন্ত্রের পথে লড়তেই হয়, এগোতেই হয়। কারণ যুগে যুগে যাঁরা অমৃতাক্ষরে ইতিহাসের বুকে রক্তলেখা লিখে গিয়েছেন — ''নহি কল্যাণকৃত কশ্চিৎ দুর্গাতিং তাত গচ্ছতি,'' লিখেছেন — ''মনুষ্যত্বং মুমুক্ষতং মহাপুরুষ সংশ্রয়ঃ।'' লিখলেন রবীন্দ্রনাথ — ''রিক্ত যারা সর্বহারা সর্বজয়ী বিশ্বে তারা।'' তাই দ্বৈত-দিগ্ধ বৈরী-বিদ্ধ আইনের জুলুমের জবাবে, 'মহাপুরুষ সংশ্রয়ঃ' — থেকেই মানুষ বলবে — ''যাহা আইনসঙ্গত তাহা ন্যায়সঙ্গত মানবিক নাও হতে পারে।'' সুতরাং আইনের আদালতে যা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা হবে তা যদি ইতিহাসের অভিনবায়নের পথিকৃৎ হয় তবে সচেতন সংগ্রামী মানুষ গণআন্দোলনের ধারাবাহিকতায় চূড়ান্ত পর্যায়ে জনতার আদালতে তাকেই প্রসিদ্ধ করবে।

রাজেন মুখোপাধ্যায়
অণ্ডাল, বর্ধমান-৭১৩৩২১

ভোট কিনতে লালুপ্রসাদের টাকা বিতরণ

ক্ষমতাসীন ডান-বাম কোন দলই এর থেকে মুক্ত নয়

লালুপ্রসাদ যাদব — সংবাদ মাধ্যমে প্রায়ই শিরোনাম হয়ে ওঠেন। তাঁর আপাত গ্রাম্যতা, শিক্ষাবঞ্চিত অতি সাধারণ মানুষের মতো কথাবার্তা, আচরণ — সবটাই বাইরের রূপ, আসলে তা বিহারের গরিব দলিত সম্প্রদায়ের 'আপনার জন' হিসেবে নিজেকে দেখানোর কৌশল। এবং সেই কাজে লালুপ্রসাদ যে অত্যন্ত সফল — সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

লালুপ্রসাদের আচরণ পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে অনেক সময় ভাঁড়ামো বা হাস্যকর মনে হলেও বিহারে তাঁর ভোটব্যাঙ্ক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলিত সম্প্রদায়ের কাছে কিন্তু তা হাস্যকর নয়। সেখানে তিনি 'গরিবোঁ কে মসিহা' — গরিবের ত্রাতা। তাহলে কি লালুপ্রসাদের রাজত্বে বিহারের গরিব মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটেছে? তা কিন্তু নয়। বরং গরিব মানুষ আরও দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে, আরও সর্বস্বান্ত হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও জাতপাতের খেলা চালিয়ে দলিত সম্প্রদায়ের 'আপনজন' ও 'ত্রাতা' হিসাবে লালুপ্রসাদ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন। কেমন করে? ঠিক যেমন করে বিজেপি তাদের রাজত্বে গরিব হিন্দু সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মানের কোন প্রকার উন্নয়ন না করেও স্রেফ ধর্মীয় সুড়সুড়ির সাহায্যে হিন্দুধর্মের চ্যাম্পিয়ান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করেছে।

যেমন করে তামিলনাড়ুর জয়ললিতা তামিল সেন্টিমেন্ট তুলে তাঁর তামিল ভোটব্যাঙ্ককে, অন্ধ্রের চন্দ্রবাবু নাইডু তেলেগু জনগণের জীবনযাত্রার মানের কোন উন্নয়ন ছাড়াই তেলেগু সেন্টিমেন্ট তুলে তেলেগু ভোটব্যাঙ্ককে, অসম গণপরিষদ অসমীয়া সেন্টিমেন্ট তুলে অসমীয়া ভোটব্যাঙ্ককে কব্জা করে রেখেছে। যেমন করে পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম নেতৃত্ব চূড়ান্ত অবাম জনবিরোধী ও মালিকতোষণকারী ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবাংলার প্রতি বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাঙালী ভাবাবেগকে সুড়সুড়ি দিয়ে ও উন্নয়নের ধূয়া তুলে সাধারণ জনগণকে প্রতারিত করছে।

নির্বাচন কমিশন বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার ঠিক পরে পরেই গরিব এলাকায় টাকা বিতরণের মাধ্যমে লালুপ্রসাদ ভোট কিনছেন, সংবাদমাধ্যমে এমন সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অনেকেই বলছেন, লালুপ্রসাদ ফেঁসে গিয়েছেন; বিহারে লালুর বিরোধী শক্তি হিসাবে বিজেপি এই প্রশ্নে লালুপ্রসাদকে চেপে ধরতে উঠে পড়ে লেগেছে। সেই সঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বের মধ্যে আশংকাও হচ্ছে যে, লালুপ্রসাদ গরিবের জন্য টাকা বিলির এই অপরাধটিকে সুকৌশলে ভোট ব্যাঙ্ক গোছানোর কাজে লাগাতে পারেন। অর্থাৎ তিনি স্বভাবসিদ্ধ ধূর্ততার সঙ্গে প্রচার চালাবেন যে, গরিবকে সাহায্য করা কি অন্যায়? অথচ সেই কাজ করার জন্য উচ্চবর্ণের পার্টি বিজেপি তার বিরুদ্ধে লেগেছে। এইভাবে সহজ সরল গরিব দলিত ভোটারদের নিজের পক্ষে সংহত করে ফেলবেন লালুপ্রসাদ। এবং করছেনও তাই। ফলে, সংবাদমাধ্যমে গরিবদের মধ্যে টাকা বিলির বিষয়টি ফলাও করে প্রচারিত হোক — লালুপ্রসাদ নিজেই এটা চেয়েছেন কিনা — নানান মহলে এমন প্রশ্নও উঠেছে।

কিন্তু সে যাই হোক, লালুপ্রসাদের নির্বাচন বিধি লঙ্ঘনের ঘটনায় তাঁর বিরাট কিছু শাস্তি হয়ে যাবে — এ অবিশ্বাস্য। গত লোকসভা নির্বাচনের প্রচার চলাকালীন বাজপেয়ীর কেন্দ্র লক্ষ্ণৌতে গরিব মহিলাদের মধ্যে শাড়ি বিলি করেছিলেন বিজেপি নেতা লালজী ট্যান্ডন; সেখানে এত ভিড় হয় যে পদপিষ্ট হয়ে ২১ জন ঘটনাস্থলেই মারা যান। কী মর্মান্তিক! অথচ কিছুই হয়নি লালজী কিংবা বাজপেয়িজীর। সেই বাজপেয়িজী এখন বড়গলায় লালুর অবৈধ কর্মের নিন্দা করছেন লোকসভায়। কংগ্রেস বহু বছর কেন্দ্রে এবং বিশেষত পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতাসীন ছিল। তারা ভোটারদের প্রভাবিত করবার উদ্দেশ্যে চাল গম কম্বল শাড়ি গরিব মানুষের মধ্যে কি বিলি করেনি? সিপিএম এ রাজ্যে ভোটের ঠিক আগে টাকা চাল শাড়ি লুঙ্গি পাড়ায় পাড়ায় বিতরণ করে না? তবু কারো কিছু হয় না, হওয়ারও নয়। কারণ, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটাও আজ আর অবশিষ্ট নেই। এখন ঘুষ দিয়ে, উৎকোচ দিয়ে, প্রলোভন দেখিয়ে, ভয়ভীতি ও চরম সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ভোট কব্জা করতে হয় এবং তার ভিত্তিতেই জয়, ক্ষমতা দখল ! তারপরই বড় গলা করে নেতারা-মন্ত্রীরা তাঁদের ফাটা রেকর্ড বাজাতেই থাকবেন, তাঁরা নাকি বিপুল জনসমর্থনের ভিত্তিতে জিতে এসেছেন ! গণতন্ত্রের এই হাল শুধু কি এদেশে? বৃটেনে প্রধানমন্ত্রী ব্লেয়ার চূড়ান্ত মিথ্যাচার চালিয়েও, সত্য বলার অপরাধে বিজ্ঞানী হত্যা করেও গণতন্ত্রের শিরোমণি হয়ে বসে আছেন। জাপানে দুর্নীতির দায়ে একের পর এক প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। একজনের পর অন্যজন যিনি ভোটে জিতে প্রধানমন্ত্রী হলেন তিনিও দুর্নীতিগ্রস্ত — এই হল জাপানের অভিজ্ঞতা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসংখ্য গরিব ও কালো মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে, প্রশাসনিক কারচুপি ও আদালতের বিচারপতিদের বশীভূত করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিততে হয় বুশকে। এইভাবে গণতন্ত্রের চ্যাম্পিয়ান সেজে বুশ-ব্লেয়ার এখন দেশে দেশে গণতন্ত্র(!) রপ্তানি করে বেড়াচ্ছেন।

আমাদের মহান বৃহত্তম গণতন্ত্রের(!) এই দেশে গণতন্ত্রের চ্যাম্পিয়ান দেশনায়করা চুরি জোচ্চুরি দুর্নীতিতেও চ্যাম্পিয়ান। সবই চলছে গণতন্ত্রের নামে। রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে বোফর্স কামান কেনায় ঘুষ নেওয়া, নরসীমা রাওয়ের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়া, বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে তহলকা উটকম কেলেঙ্কারিতে বিপুল অঙ্কের টাকা ঘুষ দেওয়া যার চিত্র ফুটে উঠেছে গোপন ভিডিও ক্যামেরায়, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার বিরুদ্ধে বিপুল সরকারি অর্থ তছরূপ, লালুপ্রসাদের বিরুদ্ধে পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি, হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ, মায়াবতীর বিপুল সম্পত্তি অর্জনের নানা কাহিনী, সিপিএম নেতা-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ ও আয় বহির্ভূত সম্পত্তি ইত্যাদির বহু বহু অভিযোগ নিয়ে সংবাদমাধ্যম, আইন আদালত ব্যাপকভাবে আলোড়িত হয়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত কী দাঁড়িয়েছে? সব নেতা-মন্ত্রীরা সব কিছু ম্যানেজ করে নিয়েছেন ও নিচ্ছেন। ভুক্তভোগীরা বলেন, বিচারব্যবস্থাও নাকি দুর্নীতির উর্ধ্বে নয়। কিছুদিন আগে আদালতে ঘুষ দিয়ে এক সাংবাদিক রাষ্ট্রপতি ও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বের করে আদালতের ভেতরের চেহারাটা প্রকাশ করে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন — এটাও অনেকে ভোলেননি। বিশ্বজুড়ে প্রচারমাধ্যমগুলি এবং তথাকথিত খ্যাতনামা কলমচিরা যে গণতন্ত্রের জন্য দিবারাত্র গলা ফাটাচ্ছেন, সেই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দশা আজ এমনই চূড়ান্ত পচাগলা দুর্গন্ধময়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যেমন আজ শুধুমাত্র শোষণ অত্যাচার লুণ্ঠন ও কদর্য অপসংস্কৃতি ছাড়া সাধারণ মানুষকে দেওয়ার মতো আর কিছু নেই, ঠিক তেমনই এই ব্যবস্থার উপরিকাঠামো যে বুর্জোয়া গণতন্ত্র — তারও জনগণকে দেওয়ার মতো কোন সুস্থ বিষয় আর নেই। দেশে দেশে তারই নগ্নচিত্র প্রকট হয়ে উঠছে, এবং হাজার ঢাকঢোল পিটিয়েও সেগুলি ঢাকা দেওয়া যাচ্ছে না।

একমাত্র দেশ জুড়ে বামগণতান্ত্রিক আন্দোলন তীব্রতর করে তুলতে পারলে গণতন্ত্রের নামে নেতামন্ত্রীদের দুর্নীতি, ভোট কেনার ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বহুক্ষেত্রে অনেকটা রুখে দেওয়া সম্ভব, অন্তত এগুলি খানিকটা কমানো সম্ভব। কিন্তু সেক্ষেত্রেও বৃহৎ বামপন্থী দল হিসাবে পরিচিত সিপিএমের চূড়ান্ত সুবিধাবাদী ভূমিকা প্রধান বাধা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষমতায় বসে পুঁজিবাদের সেবা করতে গিয়ে তার পচা দুর্গন্ধ তাদের শরীরেও সর্বত্র ছড়িয়েছে। যেনতেনপ্রকারেন রাজ্যে ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং অন্য বুর্জোয়া দলগুলির সাথে জোট বেঁধে বিধানসভা লোকসভায় কিছু আসন সংগ্রহ করে ক্ষমতার ভাগ পাওয়াই এখন তাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা বিহারে লালুপ্রসাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে যাওয়া দূরের কথা, বরং তাকেই সমর্থন করে বলছে, বিহারে লালুর বিকল্প নেই। সেখানে বিজেপির সাম্প্রদায়িকতার খেলার বিরুদ্ধে লড়বার নামে তারা লালুর জাতপাতের খেলা ও দুর্নীতির পক্ষে দাঁড়িয়েছে। তাদের এই সমস্ত ভূমিকা জনগণের সামনে বামপন্থাকে বহুল পরিমাণে হেয় করে দিয়েছে।

এই কারণে দেশে শক্তিশালী বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ সেটাই একমাত্র পথ। ফলে যত কষ্টকরই হোক সেই আন্দোলন আমাদের গড়ে তুলতেই হবে এবং তাকে তীব্রতর করতে হবে। এই পথটিকে এড়িয়ে বিজেপি, কংগ্রেস, জয়ললিতা কিংবা লালুপ্রসাদদের টিকি ছোঁয়া সত্যিই অসম্ভব। একমাত্র রাজনৈতিক রেষারেষিতে কিছু জলঘোলা হতে পারে, কিংবা আইন আদালতের পথ বেয়ে কারও কারও কারাবাসের নামে আরাম আয়েসের বিশেষ আয়োজনও হতে পারে; তার বেশি কিছু হবে না, হওয়া সম্ভবও নয়।

সিপিএমের মতোই তৃণমূলও মুখোসধারী

তৃণমূল বিধায়ক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২১ ডিসেম্বর বিধানসভায় বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সবসময় মুখোশ পরে ঘুরছেন। তিনি শিল্পপতিদের সভায় তাঁদের মতো, আর শ্রমিকসভায় গেলে শ্রমিক নেতা হয়ে যান।' প্রশ্ন হচ্ছে, যে তৃণমূল নেতারা সিপিএমের বিরুদ্ধে এসব কথা বলছেন, তাঁরা নিজেরা কী করছেন? শ্রমিকস্বার্থের বিরুদ্ধে এবং মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় তাঁরাও তো একই ভূমিকা পালন করছেন !

রাজ্যের শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে তৃণমূল নেতা মেয়র সুব্রত মুখার্জী ২০ ডিসেম্বর মালিকদের সভায় বলেছেন, ''এখন ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা আর অবাস্তব আন্দোলন করবে না। ...ট্রেড ইউনিয়ন এখন দায়িত্বশীল ভূমিকাই নেবে'' (বর্তমান ২১-১২-০৪)। ঠিক তার পরের দিনই ২১ ডিসেম্বর ধর্মতলায় ছিল তৃণমূলের শ্রমিক সমাবেশ। এই সমাবেশে সুব্রত মুখার্জী তাঁর ভাষণে বলেন, 'রাজ্যে জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন হবেই। অবরোধ ঘেরাও ধর্মঘট শ্রমিকদের স্বার্থে সবই হবে' (সংবাদ প্রতিদিন ২২-১২-০৪)। তাহলে তাদের সাথে সিপিএমের পার্থক্য কোথায়? আসলে জঙ্গি কেন, কোন শ্রমিক আন্দোলনই তৃণমূল করছে না। চূড়ান্ত সংকটে জর্জরিত বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর উপর যে পুঁজিপতিশ্রেণী ভয়াবহ আক্রমণ নামিয়ে আনছে, তৃণমূল কংগ্রেসও সেই পুঁজিপতিশ্রেণীরই স্বার্থরক্ষাকারী দল। ফলে মালিকশ্রেণীকে বিপন্ন করতে পারে এমন কোন আন্দোলন তৃণমূলের পক্ষে করা সম্ভব নয়। তৃণমূল বড়জোর শ্রমিক ইউনিয়ন করে কারখানার গেটে আনুষ্ঠানিক মিছিল করে তার ভোটব্যাঙ্ক সংহত করা পর্যন্ত যেতে পারে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই আন্দোলনকে ধাপে ধাপে উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে পারে না। তাছাড়া তৃণমূল মালিকদের বিরাগভাজনও হতে চায় না। তৃণমূল জানে, মালিকদের মদত না পেলে ক্ষমতারোহণ বা ক্ষমতায় টিকে থাকা কোনটাই সম্ভব নয়। সেজন্য মালিকদের সভায় গিয়ে বুদ্ধদেববাবুদের মতই তাঁদেরও শ্রমিক আন্দোলন বিরোধী কথা বলতে হয়। আবার শ্রমিকদের সভায় গিয়ে গরম গরম কথা বলতে তাঁদের আটকায় না।

শ্রমিকস্বার্থের বিরুদ্ধে এবং মালিক স্বার্থরক্ষায় তৃণমূল যে সিপিএমেরই মতো, তৃণমূলের সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের আজ একথা ভেবে দেখার সময় এসেছে। মালিকশ্রেণীর সেবা করার জন্য দুই সেবকের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা চলে তৃণমূল ও সিপিএমের বিরোধের চরিত্রও ঠিক তাই।

খড়িমাটি খনিতে পুনরায় কাজ চালু

বীরভূম জেলার মহম্মদবাজার থানার অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মালিকানাধীন মিনারেল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের মকদুমনগর খড়িমাটি খনি ও যৌতাগার-এ দীর্ঘদিন ধরে সিটু পরিচালিত ইউনিয়ন ছিল। সিটু ইউনিয়নের শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপ এবং রাজ্য সরকারের শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী নীতির প্রতিবাদে কয়েকমাস আগে সকল খনি শ্রমিক সিটু ইউনিয়ন পরিত্যাগ করে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত বীরভূম চায়না ক্লে, পটারিজ অ্যান্ড ফায়ার ব্রিক্স ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে যোগদান করে মকদুমনগর মাইন শাখা কমিটি গঠন করে। সিটু ইউনিয়নের সাথে চুক্তি ছিল ছয়মাস খনির কাজ চালু থাকবে, ছয়মাস বন্ধ থাকবে। নবগঠিত ইউনিয়নের শাখা কমিটির নেতৃত্বে এই শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী কালাচুক্তি বাতিল সহ কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি, পি এফ-এর সরকারি হিসাব প্রভৃতির দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। সমস্যাগুলি, দুর্গাপুর সহ-শ্রমিক কমিশনারকেও জানানো হয়। কর্তৃপক্ষ ২ মাসের মধ্যে সরকারের কাছ থেকে শ্রমিকদের পি এফ-এর হিসাব এনে দিতে বাধ্য হয়। ইতিমধ্যে বর্ষার অজুহাতে খনির কাজ বন্ধ করে রেখে সিপিএম নেতা, সিটুর জেলা নেতা এমনকী জেলা সভাধিপতি এবং প্রজেক্টের এম ডি পর্যন্ত শ্রমিকদের পুনরায় সিটু ইউনিয়নে যোগ দেবার জন্য একদিকে আবেদন-নিবেদন, অপরদিকে ভীতিপ্রদর্শন করতে থাকে। মালিকপক্ষ নিজেই শ্রমিকদের যে শ্রমিক-ইউনিয়ন করতে বলে, সেই শ্রমিক-ইউনিয়নের পক্ষে মালিকের বিরুদ্ধে লড়াই করা কি সম্ভব ? — এ প্রশ্ন এলাকার মানুষের মধ্যে উঠেছে।

শ্রমিকরা সমস্ত ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে খনি চালুর আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে ২০ ডিসেম্বর থেকে পুনরায় খনির কাজ চালু হয়। ঐ দিন শ্রমিকরা মিছিল করে কাজে যোগ দিতে যায়। খনির মুখে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন এসইউসিআই-এর রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রতন মুখার্জী, ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড কুদ্দুশ আলি, পি এম আই ইউনিয়নের কমরেড জয়নাল আবেদিন প্রমুখ। খনি শ্রমিকদের এই আন্দোলন ও বিজয়ে ফ্যাক্টরির শ্রমিকদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ এবং আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।

নভেম্বর বিপ্লব কী এনেছিল

সোভিয়েট ব্যবস্থার তিনটি স্তম্ভ

[গণদাবী ১২ নভেম্বর ২০০৪ সংখ্যায় 'নভেম্বর বিপ্লব কী এনেছিল' শিরোনামে, প্রখ্যাত ব্রিটিশ সাংবাদিক সিডনি ওয়েবের 'দি ফিউচার অফ সোভিয়েট কমিউনিজম' নামক রচনার অনুবাদ প্রকাশ করেছিলাম। এখানে ১৯৩৬-৩৭ সালে সোভিয়েট ভ্রমণের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ এই রচনার অপর একটি অংশের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করছি। — সম্পাদক, গণদাবী]

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নের বৈশিষ্ট্যগুলি বিচার করতে গেলে আমাদের যেটা লক্ষ্য করতে হবে তা হল — সোভিয়েট ধাঁচের সমাজ-সংগঠনের তিনটি উল্লেখযোগ্য দিক রয়েছে।

বহুমুখিতা

প্রথমেই চোখে পড়ে এর কাঠামো ও কার্যধারার বহুমুখিতা। বিশ্বের সকল দেশের মধ্যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমরূপত্ব (uniformity) সবচেয়ে কম। এর শিল্প, শস্য, খনিজ দ্রব্য, জলজ সম্পদ পরিমাণগতভাবে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিকে ছাড়াতে না পারলেও বৈচিত্র্যের দিক থেকে সেগুলির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। এই সমস্ত বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থাগুলির সামাজিক কাঠামোর মধ্যে রয়েছে ব্যাপক বৈচিত্র্য — সেখানে ব্যক্তিগত হস্তশিল্পী যেমন আছে, আছে সমবায়মূলক অংশীদারিত্বের নানারকম ব্যবস্থা ও বহু পৌর প্রতিষ্ঠান, আবার আছে বিশ্বের বিশালতম রেল পরিবহন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য এক কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক কাঠামো। এমনকী রাজনৈতিক প্রশাসনেও আশি হাজার সোভিয়েটের মধ্যে রয়েছে চূড়ান্ত সাংগঠনিক বৈচিত্র্য ও পার্থক্য। এর মধ্যে রয়েছে সুমেরু বৃত্তের অন্তর্গত প্রায় জনহীন গ্রামে সোভিয়েটের প্রাথমিক সংগঠন থেকে শুরু করে মস্কোর চল্লিশ লক্ষ নাগরিককে নিয়ে গঠিত জটিল পুর-সংগঠন পর্যন্ত। সমগ্র সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র জুড়ে রয়েছে নানা জাতি, বহু ভাষা, বহু রকম জীবনযাপন পদ্ধতি, এমনকী নানারকম ধর্ম। এই সমস্ত ধরনের মানুষেরই ''সাংস্কৃতিক স্বাধিকার'' সুনিশ্চিত করা হয়েছে, এবং সভ্যতার অবধারিত এবং প্রায় সর্বজনীন অগ্রগতি ও তার সাথে তাল রেখে সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি দেশাত্মবোধজনিত ক্রমবর্ধমান ঐক্য গড়ে ওঠার ফলে কিন্তু — অন্তত আমি যতটা বুঝেছি — বহুমুখিতার এই মৌল চরিত্রটিকে ত্যাগ করার বা এমনকী দুর্বল করারও চেষ্টা হয়নি। গত দশকে বরং এই বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

সর্বজনীনতা

সোভিয়েট ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল সবকিছুকেই সর্বজনীন করে তোলার চেষ্টা। কোন একটি ক্ষেত্রে যেকোনো একটা অগ্রগতি ঘটলেই সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বত্র যেখানেই সেই ক্ষেত্রটি রয়েছে সেখানেই তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। গণশিক্ষার ক্ষেত্রে যেকোন সম্প্রসারণ বা উন্নতি ঘটলে তা পশ্চাদপদ এলাকাগুলিতে, বস্তুত সমস্ত পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর কাছেই তা পৌঁছে দেওয়া হয়। বাস্তবে, রাশিয়ান বা ইউক্রাইনিয়ানদের তুলনায় পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের খাতে মাথা পিছু কেন্দ্রীয় বরাদ্দ অনেক বেশি। এই ব্যাপারটা সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই একেবারে অন্যরকম — তা সে ব্রিটিশ হোক বা ওলন্দাজ হোক, ফরাসি বা পর্তুগিজ হোক; এমনকী যে সব দেশ ঠিক সাম্রাজ্য নয়, বিভিন্ন প্রাদেশিক কাঠামোয় বিভক্ত সেই জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র বা সুইজারল্যান্ডের ক্ষেত্রেও আলাদা। নতুন নতুন খনি শিল্প বা কলকারখানা গড়ে তোলার সময় ভৌগোলিক স্থান নির্বাচনেও এই একই সর্বজনীনতা চোখে পড়ে। এগুলো সমস্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এক একটা বিশেষ জায়গায় বিশেষ শিল্প গড়লে উৎপাদন খরচ যে কম পড়বে, কিংবা বিদেশি আক্রমণের ভয় কম হবে, বা এমনকী অতিব্যস্ত রেলওয়ে পরিবহন ব্যবস্থার উপর চাপ কম পড়বে — এইসব ভাবনাচিন্তার চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যাতে কোন অঞ্চলের জনসাধারণই নিজস্ব এলাকায় নানা বিকল্প ক্ষেত্রে নানা ধরনের কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়, সেই বিষয়টির উপর। ভবিষ্যতে সর্বজনীনতার এই মূল নীতিকে ত্যাগ করার কোন লক্ষণ আমি দেখছি না।

গণউদ্যোগ

সোভিয়েট ধাঁচের সমাজব্যবস্থার তৃতীয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, সমস্ত যৌথ কার্যক্রমে এবং সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বাধিক সম্ভব জনগণের অংশগ্রহণের উপর ক্রমাগত গুরুত্ব আরোপ। রাজনৈতিক ভোটদাতাদের ভূমিকা এখানে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক, তার ওপর এখন আগেকার সমস্ত বৈষম্যগুলি দূর করা হচ্ছে এবং আগে যাদের ভোটাধিকার ছিল না তাদের অধিকার দেওয়া হচ্ছে। এখানকার শ্রমিক সংগঠন ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে কয়েক কোটি সদস্য রয়েছে, তাদের নিয়ে অন্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যায় এবং অনেক বেশি ঘন ঘন মিটিং করা হয় এবং মিটিংগুলিতেও সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের উপস্থিত থাকাটাই এখানে রীতি। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও সমানভাবেই মিটিংগুলিতে অংশ নেয়। গ্রামীণ এলাকার মতো বড় বড় ঘনবসতিপূর্ণ শহরের জনপরিষেবার দৈনন্দিন কাজে শুধু বেতনভোগী কর্মচারীরাই নয়, এমনকী নির্বাচিত কাউন্সিলাররা নিজেরাও অংশগ্রহণ করে। শুধু তাই নয়, একটা বড় ভূমিকা পালন করে সাধারণ নাগরিকগণ — যারা বিনা বেতনে স্বেচ্ছায় সামাজিক কাজ হিসাবে এটা গ্রহণ করেছে। জানা যায়, শুধু মস্কো শহরেই এরকম সমাজসেবায় নিযুক্ত আছে পঞ্চাশ হাজার নরনারী — এটাই তাদের অভ্যাসে পরিণত। সমস্ত পেশার সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের নিজেদের পছন্দ মতো জনপরিষেবার কোন না কোন কাজে স্বেচ্ছাশ্রমদান যে নৈতিক দায়িত্ব এটা সবসময় বোঝানো ও শেখানো হচ্ছে এবং বেশিরভাগই সেই দায়িত্ব পালন করছেন। এই যে গণপ্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণের ব্যাপারটায় জোর দেওয়া হচ্ছে এবং বেশিরভাগই সেই দায়িত্ব পালন করছেন, এটা যে কেবল কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যই করা হচ্ছে তা অবশ্যই নয়; এটা বিশ্বাস করারও কোন কারণ নেই যে উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষিত ও বিশ্বস্ত একদল প্রশাসনিক কর্মচারী দিয়ে কাজটা যেমন হত এতে তার চাইতে দক্ষতা বেশি দেখা যাচ্ছে। এখানে মনে করা হয় যে — সমাজসেবার কাজে সকলে মিলে এইভাবে অংশগ্রহণ করাটা সত্যিকারের গণতন্ত্রের একটা অপরিহার্য শর্ত। যে দেশে জনসাধারণের কোন কাজই তাদের নিজেদের উদ্যোগে হয় না, এবং নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সাধারণ স্বার্থে মানুষ কাজ করে না, সেখানে ভোটাভুটির কোন পদ্ধতি দিয়েই গণতন্ত্র সুনিশ্চিত হতে পারে না।

নতুন সংবিধান

ভবিষ্যতের পথে সোভিয়েট ইউনিয়ন সবচেয়ে বড় পদক্ষেপটি নিয়েছে তার সংবিধান প্রণয়নের পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। সবচেয়ে ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত বিরোধের মীমাংসা ঘটিয়ে এতবড় একটা রাষ্ট্রের জন্য একটা নতুন ও চূড়ান্ত গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন করা সত্যই বিস্ময়কর। পৃথিবীতে এ যাবত এর দ্বিতীয় নজির নেই। সংবাদপত্রে যে সব মন্তব্য বেরিয়েছে তাতে এই সংবিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রসঙ্গটি বাদ পড়ে গেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে বৃহত্তর নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা সরাসরি প্রতিনিধি নির্বাচন গ্রামে ও শহরে সমানভাবে কার্যকর হয়েছে — ৯.১ কোটি ভোটের মধ্যে ৭.৭ কোটি ভোটদাতা ভোট দিয়ে সোভিয়েটগুলিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করেছে। সার্বজনীন সরাসরি নির্বাচনের বিষয়টি ১৯০৩ সালেই বলশেভিক পার্টির কর্মসূচিতে গৃহীত হয়েছিল। ১৯১৭-১৮ সালে বিপ্লবের উথালপাথাল সময়ে এবং তারপরের বারো বছর সময়কালে পুনর্গঠনের কাজে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করায় অল ইউনিয়ন কংগ্রেস অব সোভিয়েটস্ বা কেন্দ্রীয় পরিষদের মতোই প্রাদেশিক ও জেলা স্তরের চার-পাঁচ হাজার পরিষদও পরোক্ষ নির্বাচনের দ্বারা গঠিত হয়ে এসেছে — অনেকটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেনেটের সদস্যরা যেভাবে নির্বাচিত হতেন সেভাবে। বাইরের লোকেরা বুঝতেই পারবেন না, পরোক্ষ নির্বাচনের বদলে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করায় সেনেটের গঠনে ও চরিত্রে কতখানি পরিবর্তন ঘটে গেছে। সোভিয়েট রাশিয়াতেও অনুরূপ পরিবর্তনের ফলে তার চেয়ে বেশি পরিবর্তন হবে বলে কেউ জোর দিয়ে বলতে পারবে না। এমনকী ছোট ছোট সভায় হাত তুলে ভোটদানের পরিবর্তে বহু ভোটার অধ্যুষিত বড় বড় নির্বাচনী কেন্দ্রগুলিতে গোপন ব্যালটপদ্ধতির ফলেও সোভিয়েট ইউনিয়নের বিশেষ অবস্থায় খুব বেশি ফারাক চোখে পড়বে না।

একই কথা প্রযোজ্য আরও বেশি নাগরিককে ভোটাধিকার দেওয়া এবং গ্রাম ও শহরের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপারেও। বোঝাই যাচ্ছে, ভোটাধিকার না দেওয়াকে বা নির্বাচনী অধিকারের বৈষম্যগুলিকে এবার জোর দিয়ে পাল্টানো হচ্ছে। যারা অন্যায়ভাবে সম্পত্তি বানিয়েছিল, যারা অসামাজিক কার্যকলাপে যুক্ত ছিল, কিংবা যারা প্রয়াত জারের কোনরকম আত্মীয়, বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর সদস্য — সোভিয়েট নাগরিক হিসাবে তাদের কাউকেই এখন থেকে ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হবে না। অনেকে হয়ত খেয়ালই করেননি, এইরকম বাদসাদ দেওয়া ইতিমধ্যেই বাস্তবে উঠে গিয়েছে। এটা ঠিক যে, ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে পার্টির নীতি বদল না হলেও প্রায় পঞ্চাশ হাজার গ্রিক অর্থোডক্স চার্চের পাদরি, এবং কয়েক শত রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্ট, মুসলিম ও বৌদ্ধ ধর্মগুরুকে ভোটদানের বা ভোটে দাঁড়ানোর অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নয় কোটি ভোটদাতার মধ্যে পঞ্চাশ হাজারের কী এমন গুরুত্ব! উপরন্তু এতদিন যেখানে গ্রামীণ মানুষদের দু'জনের ভোট শহরের একজনের ভোটের সমান (বাইরে সচরাচর পাঁচ জনের সমান বলা হয়) ধরা হত, এখন থেকে ছয় কোটি গ্রামীণ ভোটদাতাদের প্রত্যেকের ভোট শহরের তিন কোটি ভোটারের প্রত্যেকের ভোটের সমান বলে গ্রাহ্য হবে। রাশিয়ায় চাষীদের উপর নির্যাতন চলছে বলে সবসময় যে কুৎসা করা হয়, তার উপযুক্ত জবাব স্ট্যালিন এইভাবেই দিয়েছেন। অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আশা করা হচ্ছে যে, গ্রামের লোকেরা তাদের শহর নিবাসী ছেলে-মেয়ে বা ভাইবোনদের মতোই একইভাবে ভোট দেবে।

কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে নির্বাচনী পদ্ধতির সংশোধন নয়, যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন বলে মনে হবে তা হল, সংবিধানে প্রদত্ত কয়েকটি নতুন ধরনের ''মানুষের অধিকার''। ১৭৭৬ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্রোহীদের স্বাধীনতার ঘোষণা এবং ১৭৮৭ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান — দুটোরই ভিত্তি ছিল মুনাফা করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর ব্যক্তির অবাধ মালিকানা। ফরাসি বিপ্লবের পর ১৭৮৯ সালের মানুষের অধিকার সংক্রান্ত (এবং ১৭৯৩ সালে পুনর্লিখিত) ঘোষণারও ভিত্তি ছিল একই। তখন মনে করা হত, মুনাফার অধিকার হল অর্থনৈতিক বিকাশের বনিয়াদ। এমনকী বেনথাম তাঁর প্রিন্সিপল্‌স অব আ সিভিল কোড রচনায় ব্যক্তিসম্পত্তির উপর একটি মাত্র ব্যাপারে হস্তক্ষেপের বন্দোবস্ত রেখেছিলেন, তাহল ট্যাক্স বসানোর ক্ষেত্রে; এবং সরকারের চারটি ''লক্ষ্য'' নির্দিষ্ট করেছিলেন — যথা, প্রত্যেকের ভরণপোষণ, নিরাপত্তা, সমতা এবং স্বাচ্ছন্দ্য, যদিও এগুলো কীভাবে সম্ভব হবে তা বলে যাননি। ১৯৪৮ সালে লুই ব্লাঁ রাষ্ট্রের কাছে চাকরি পাওয়ার অধিকার বা ''কাজের অধিকার'' চেয়ে বৃথাই দরবার করেছিলেন। ১৯৩৬ সালে সোভিয়েত সংবিধান প্রতিটি নাগরিককে শুধুমাত্র আক্রমণ ও নির্বিচার গ্রেফতারির বিরুদ্ধে নিরাপত্তা প্রদান করেনি, দিয়েছে উপযুক্ত বেতনে কাজ পাওয়ার অধিকার; মা হওয়ার সময় অনেকরকম বিশেষ ব্যবস্থা; নির্দিষ্ট সময় বিশ্রাম ও কয়েক সপ্তাহ সবেতন ছুটি কাটানোর অধিকার; বিনা পয়সায় যে কোন বয়সে যেকোনোরকম ও যেকোন স্তর পর্যন্ত শিক্ষালাভের অধিকার; এবং সর্বোপরি, জীবনের সমস্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, প্রয়োজন অনুযায়ী, সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক সাহায্য প্রাপ্তির অধিকার। যেটা আরো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তা হল, এই সমস্ত ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ''মানুষের অধিকার''গুলি সংবিধানে রাখা হয়েছে শুধু নয়, ইতিমধ্যেই এগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে কার্যকর করা হয়েছে।

নতুন সংবিধানের এইরকম বারোটি ''মানুষের অধিকার''কে যদি সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে দেওয়া যায় এবং বলশেভিকরা রুশভাষা থেকে যে বাচনভঙ্গিতে অনুবাদ করেছে, বা মূল পাঠে যে শব্দবন্ধ আছে, সে সবের বদলে ব্রিটিশ পাঠকরা বুঝবে এরকম ভাষায় যদি লিপিবদ্ধ করা যায়, তাহলে হয়ত সকলের সুবিধা হবে ঃ

১। ভোটের অধিকার — জাতি, লিঙ্গ, বর্ণ নির্বিশেষে ১৮ বছর বয়স থেকে সকলে সমান ও সার্বিকভাবে অবাধে, সরাসরি, গোপনে নীচের স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সমস্ত পরিষদের ভোটে, অর্থনৈতিক বা অন্য কোন নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই, অংশগ্রহণ করতে পারবে।

২। সমালোচনার অধিকার — সর্বোচ্চ নির্বাচিত পরিষদে যা দীর্ঘ আলোচনার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে গৃহীত হয়েছে, তাকে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বাধা দেওয়ার অধিকার বাদে সকলেই গণপ্রশাসনের প্রতিটি অংশের সমালোচনা করতে এবং গণপ্রশাসনের কাজের রদবদলের জন্য জনসভা করে এবং পুস্তিকা ছাপিয়ে আন্দোলন করতে পারবে এবং সভার জন্য জায়গার ব্যবস্থা, পুস্তিকা ছাপানোর জন্য কাগজ ও ছাপাখানার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।

৩। যখন তখন গ্রেফতারি থেকে বাঁচার স্বাধীনতা — ইউরোপের অন্যান্য দেশের প্রশাসনের মতোই। ইংল্যান্ডের অত্যন্ত জনপ্রিয় বিশেষ সুরক্ষার ব্রিটিশ ব্যবস্থা হেবিয়াস কর্পাস আইনটি এখানে নেই। কিন্তু (১২৭নং ধারা অনুযায়ী) ''ইউ এস এস আর''-এর নাগরিকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সুনিশ্চিত থাকবে। আদালতের সিদ্ধান্ত বা রাষ্ট্রের কোন অ্যাটর্নির অনুমোদন ছাড়া (অর্থাৎ সরকারি প্রধান উকিলের অধীনস্থ বিচার- বিভাগ — বর্তমানে যা প্রশাসনিক কাঠামো থেকে আলাদা — তার অনুমোদন ছাড়া) কোন ব্যক্তিকেই গ্রেফতার করা যাবে না।

৪। বাক্ স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জমায়েত ও সভা করার স্বাধীনতা, এবং মিছিল করা ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের স্বাধীনতা — ১২৫নং ধারা

সাতের পাতায় দেখুন

কেন্দ্রের অন্তর্বর্তী আর্থিক সমীক্ষা
সিপিএমের নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ

কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ইউ পি এ সরকার গত ১৩ ডিসেম্বর বর্তমান আর্থিক বছরের মধ্যবর্তী সমীক্ষা পেশ করার দশ দিনের মধ্যেই ঘোষণা করেছে, রান্নার গ্যাসে ভর্তুকি তুলে দেওয়া হবে এবং সামগ্রিকভাবে ভর্তুকি ছাঁটাই করা হবে। কেন্দ্র একথা বলার সাথে সাথে জনবিরোধী সংবাদপত্রকূল মূল গায়েনের দোহার ধরে বলেছে — সরকারি আয়ের ৪৪ ভাগই ভরতুকিতে চলে যাচ্ছে, এটা চলতে পারেনা। অতএব ভরতুকি তুলে দিতে হবে। উদারনীতির এসব প্রবক্তারা জানেন, ভরতুকি সরকার তুলবে না। কারণ মোট সরকারি ভরতুকির ৫৮ শতাংশের বেশি যায় ধনী, শিল্পপতি ও কৃষিপুঁজিপতিদের পকেটে। ছাঁটাইয়ের কোপ পড়বে প্রধানত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্যাস, কেরোসিনের দাম প্রভৃতিতে দেওয়া সরকারের প্রত্যক্ষ ভরতুকিতে (৪৪০০০ কোটি টাকা), যার খানিকটা মধ্যবিত্ত ও গরিব মানুষ পায়। কাজেই 'ভরতুকি তুলে দাও' স্লোগানের পিছনকার আসল কথাটা হল প্রত্যক্ষ ভরতুকি কমাও, বোঝা চাপাও জনগণের ওপর।

ভরতুকি কতটুকু

বলা হচ্ছে, সরকারি আয়ের ৪৪ শতাংশ যাচ্ছে ভরতুকিতে। কেন এ অবস্থা হল ? যদি সরকার দেশের আর্থিক বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে নিজের আয় বাড়াতো তাহলে মোট ভরতুকি বাড়ালেও মোট আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে শতাংশের হিসাবে ভরতুকি কমাই উচিত ছিল। আয় বাড়ার ফলে বাড়তি ভরতুকি দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের অক্ষমতার প্রশ্নও উঠতো না। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হল, ধনীদের কর ছাড় দিয়ে দিয়ে সরকার তার আয় অনেকটা কমিয়ে ফেলেছে। ভরতুকি বেশি বলে সমস্যা হচ্ছে, এটা সত্য নয় ; মালিকদের বিপুল ছাড় দিয়ে সরকার নিজের আয় কমিয়ে ফেলেছে, এটাই আসল সমস্যা। সরকারি হিসাবেই দেখা যাচ্ছে, ৫০-৫১ সালে সরকারি আয়ের ৮৮ শতাংশ আসত কর থেকে, ২০০৩-০৪ সালে সেটা ৭৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। গরিবের ব্যবহার্য দ্রব্য বা নিম্ন আয়ের মানুষের ওপর করের ভার প্রতি বছরই বাড়া সত্ত্বেও কর বাবদ আয় আনুপাতিক হারে ১৫ শতাংশ কমেছে কেন ? কারণ উচ্চ আয়ের ওপর আয়কর, কোম্পানি কর, আমদানি শুল্কে বিশাল ছাড় দেওয়ায় গরিবের ঘাড় ভেঙে বেশি কর আদায় করা সত্ত্বেও তাতে ছাড়ের ঘাটতি পূরণ হচ্ছে না। সরকারের আয় কমেই যাচ্ছে।

অন্যদিকে কর বহির্ভূত আয় (প্রধানত ঋণ) ১২ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৭ শতাংশ হয়েছে। ঋণের সুদ দিতেই চলে যাচ্ছে বিশাল অঙ্কের টাকা। ২০০২-০৩ সালে সুদ বাবদ খরচ হয়েছে ১,১৫,৬৬৩ টাকা, সরকারের আয়ের ৪৮.৮ শতাংশ। এ অবস্থায় সরকারের আয় বাড়াবার কথা বলাটাই ছিল সঙ্গত ; ব্যয়সঙ্কোচের জন্য সামরিক ব্যয়, মাথাভারি প্রশাসনের জন্য ব্যয় — ইত্যাদি কমানোর কথা ভাবা উচিত ছিল। কিন্তু সে পথে না গিয়ে সরকার মোট যে ভর্তুকি দেয়, যার ছিটেফোঁটা মাত্র পায় জনগণ — সেখানে ব্যয় কমাবার পরিকল্পনা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। ভোটের পরে ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচিতে দেওয়া প্রতিশ্রুতি তারা শিকেয় তুলে দিয়েছে। সি পি এম লোকদেখানো মৌখিক প্রতিবাদটাকেও এখন মিনমিনে অনুযোগের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে।

দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় সাধারণ মানুষের জন্য এই সরকার যা করতে পারত তা কিছুই করেনি; অন্যদিকে মালিকশ্রেণীর স্বার্থে কী কী করা সম্ভব তা খুঁটিয়ে দেখেছে এবং দেশের বাজার বিদেশি পুঁজির কাছে আরও হাট করে খুলে দেওয়ার চিন্তাভাবনা ব্যক্ত করেছে। তারা এই সবটাই করেছে সিপিএমের সমর্থনের ওপর দাঁড়িয়ে। এটাও পরিষ্কার, সংসদীয় অর্থে দর কষাকষি করে জনস্বার্থে ছিটেফোঁটাও সিপিএম আদায় করতে পারেনি শুধু নয়, তার চেষ্টাও করেনি। অন্তর্বর্তী এই রিপোর্টের সমালোচনাও সিপিএম করেছে গণশক্তির সম্পাদকীয়তে। কিন্তু যেটা তারা ঘুণাক্ষরেও বলেনি, তা হল — তাদের সমর্থন ছাড়া এই কেন্দ্রীয় সরকার কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তই নিতে পারে না।

জনস্বার্থে কী করতে পারত কেন্দ্রীয় সরকার

কেন্দ্রীয় সরকার চাইলে এখন ব্যাঙ্কের মেয়াদী আমানত ও অন্যান্য জমা টাকার ওপর সুদের হার বাড়াতে পারত। তাতে অবশ্য সুদনির্ভর জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ত না। তবে বাজারে মূল্যবৃদ্ধির ফলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা যে হারে হ্রাস পাচ্ছে, সেই ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের গতিটা একটু ধীর হতো। সকলেই জানেন, সুদের হারের সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির হারের একটা সরাসরি যোগ আছে। খুব নিখুঁত অঙ্কে না হলেও বিষয়টা বোঝার জন্য ধরা যাক, মুদ্রাস্ফীতির হার ৭% (বর্তমানে যা চলছে)। এই অবস্থায় বছরের শুরুতে ১০০ টাকা ব্যাঙ্কে রাখলে বছর শেষে তার প্রকৃত মূল্য ৯৩ টাকায় দাঁড়ায়। ফলে বছর শেষে ৯৩ টাকায় ৭ টাকা সুদ দিলে, অর্থাৎ শতকরা ৭.৫০ শতাংশ সুদ দিলে আসলে ক্রয়ক্ষমতার বিচারে কেবল মূল টাকাটাই ফেরৎ হয়, কিছুই বাড়তি দেওয়া হয় না। তাই, মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়লে টাকার দাম কমে যাওয়ায় অঙ্কের হিসাবে সুদের হার বাড়ানো যায়। অথচ ব্যাঙ্কের মেয়াদী জমায় সুদ সর্বোচ্চ ৬.৫০%, প্রভিডেন্ড ফান্ডের সুদ ৮.৫০%, যা মুদ্রাস্ফীতির জন্য ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসকে হিসাবে নিলে ১% মাত্র। বর্তমানে সরকারি হিসাবে মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়ছে; এন ডি এ আমলের চার- সাড়ে চার শতাংশ থেকে বেড়ে সাত-আট শতাংশ চলছে। এটা অবশ্য সকলেরই জানা যে, সরকারি এই হিসাবের চেয়ে বাস্তবে মূল্যবৃদ্ধি সর্বদাই বেশি হয়। হিসাবের এই কারচুপিটা এন ডি এ এবং ইউ পি এ — দুই সরকারের ক্ষেত্রেই সমান। কাজেই সেটাকে ধরে নিয়ে বলা যায়, মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়ার ফলে সুদের হার অঙ্কের হিসাবে বাড়ানো সম্ভব ছিল। বাস্তবে জনগণের কাছে মুখরক্ষার দায়টুকু স্বীকার করলেও সিপিএম এই পরিস্থিতিতে শুধু অনুনয়-বিনয় নয়, চাপ দিয়ে সুদের হার কিছুটা বাড়াবার ব্যবস্থা করাতে পারত। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি'র বিরুদ্ধে সুদের হার কমানোর অভিযোগ তারা ব্যাপকভাবে কাজেও লাগিয়েছিল। কংগ্রেস জোট ক্ষমতায় আসার পর মুদ্রাস্ফীতির হার বেশ বেড়ে যাওয়ায় সংবাদপত্রের নানা প্রবন্ধে অনেকে অনুমান করছিলেন, বোধহয় এবার সুদের হার বাড়িয়ে কংগ্রেস এবং সিপিএম প্রাক-নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার একটা চমক দেবে। এখন সুদের হার বাড়ালে সরকারকে যে বাস্তবে কোন বাড়তি আর্থিক দায়িত্ব নিতে হবে না — এত তলিয়ে অর্থনীতি জনগণ বুঝবে না। কাজেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার ধোঁকা দেওয়ার এটাই ছিল সুসময়। কিন্তু সেটুকুও এখন বাহুল্য মনে করছে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার। তারা কেবল প্রভিডেন্ড ফান্ডের প্রচলিত সুদের হার বজায় রাখার এবং ভবিষ্যতে মাত্র এক শতাংশ বাড়াবার আশ্বাস মাত্র দিয়েছে। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সিপিএম চাপ দিয়ে ব্যাঙ্ক সহ সবরকম জমায় সুদ বাড়াবার ন্যায্য দাবিটা আদায় করতে পারল না কেন? কারণ, কংগ্রেস নেতারা বুঝে গিয়েছেন, সিপিএমের দেউলিয়া রাজনীতির দৌড় কতদূর! তাঁরা বুঝেছেন, ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে এন ডি এ জোটের বিকল্প বুর্জোয়া জোট হিসাবে কংগ্রেস জোটে থাকতে সিপিএম বাধ্য। কাজেই সিপিএমকে খুশি রাখার দায়ও কংগ্রেসের নেই।

আর কী করতে পারত কেন্দ্রীয় সরকার? তারা পেট্রল ডিজেল ও রান্নার গ্যাসে করের হার কমাতে পারত। সম্প্রতি ভরতুকি খাতে যে ৪৪৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ কমানো হয়েছে, (দ্রঃ ইকনমিক টাইমস ১৪-১২-০৪) তা না কমালে; অর্থাৎ পুরানো বরাদ্দ বজায় রাখলে বাড়তি ভরতুকি বরাদ্দ ছাড়াই তারা তেলের ও গ্যাসের দাম বেশ কিছুটা কমাতে পারত। তাছাড়া আরও একটা উপায় সরকারের হাতে ছিল। বাজেটে তেল ও গ্যাস থেকে কর বাবদ যে আয় তারা হিসাবে ধরেছিল, সেই আয় বজায় রেখেও কর কমানো যেত। কারণ তেলের মূল দর বাড়ার ফলে কর বাবদ আয়ও বেড়ে যায়। সেই বাড়তি আয়টা, কোন ক্ষতিস্বীকার না করেও ছাড় দেওয়া যেত। সেটাও কেন্দ্রীয় সরকার দেয়নি। আর সিপিএম যেহেতু পেট্রল, ডিজেল ও গ্যাসের ওপর রাজ্যের করের চড়া হার বিন্দুমাত্র না কমিয়ে বাড়তি টাকা তুলতে চাইছে, তাই তারাও কেন্দ্রের করের হার কমিয়ে ডিজেল বা রান্নার গ্যাসের দাম কমানোর জন্য কোন কার্যকরী চাপ দিল না।

মালিকশ্রেণীর স্বার্থে তারা কী করছে

কেন্দ্রীয় সরকার পরিষ্কার ভাষায় যা বলেছে তা হল, বার্ষিক ৮ শতাংশ আর্থিক বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। ১৫ ডিসেম্বর গণশক্তি সম্পাদকীয় কলমে লিখেছে — ''বাজেটে সরকার উদারনীতির পক্ষে ওকালতি করার ততটা সাহস না পেলেও, মধ্যবর্তী পর্যালোচনায় সেই ঘাটতি পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করেছে। ...চিদাম্বরম সমস্যার সমাধানে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের সুযোগ বৃদ্ধির দাওয়াই দিচ্ছেন।... দেশের বাজার আরও খুলে দেওয়ার পক্ষেই বলে চলেছেন চিদাম্বরমরা।'' বিনিয়োগ বিদেশি হবে নাকি স্বদেশি হবে, এ প্রসঙ্গে কাগজে কলমে সিপিএম যাই-ই বলুক, সিপিএম-কংগ্রেস-বিজেপি-তৃণমূল সকলেই বলছে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। কারণ আর্থিক উন্নয়নের চাবিকাঠি নাকি বিনিয়োগ বাড়ানো। এজন্য কেন্দ্র ও নানা রাজ্যের সরকারগুলির মতো সিপিএমও মালিকদের কর ছাড় দিচ্ছে, তোয়াজ করছে। অথচ দেশের সমস্যার মূলে হচ্ছে চাহিদার অভাব। এদেশে এখন ১৩% হারে বিনিয়োগ বাড়ছে, অথচ চাহিদা বাড়ছে ১০% হারে (দ্রঃ বর্তমান ২-১২-০৪) কাজেই বিনিয়োগ যত বাড়বে, বাস্তবে সমস্যা ততই বাড়বে — এটাই পুঁজিবাদী সঙ্কটের নিয়ম।

''দেশের বাজার খুলে দেওয়ার পক্ষেই বলে চলেছেন চিদাম্বরমরা'' বলে গণশক্তি যেকথা লিখেছে, সেকথা লেখার সময় তাঁদের বোঝা উচিত ছিল, 'চিদাম্বরমরা' বলতে সিপিএমকেও বোঝায়। বস্তুত ইতিমধ্যেই বিপুল লাভজনক টেলিযোগাযোগ ব্যবসায় বৃহৎ বেসরকারি পুঁজিকে (যাদের অন্যতম সুনীল মিত্তাল আবার বিজেপি ঘনিষ্ঠ) অ্যাকসেস ডেফিসিট চার্জে (এডিসি) বড় রকম ছাড় ঘোষণার প্রস্তুতি চলছে। সরকারি টেলিকোম্পানি বি এস এন এল গ্রামাঞ্চলে টেলিযোগাযোগ প্রসারিত করা ও চালু রাখার জন্য যে আর্থিক দায় বহন করে তার কিছুটা ক্ষতিপূরণ হিসাবে বেসরকারি টেলিকোম্পানিগুলিকে দিতে হয়, যেটা তারা কলচার্জের সঙ্গে যুক্ত করে — এটাই এডিসি। এই চার্জে ছাড় দিলে আপাতভাবে মনে হবে, এতে শহরাঞ্চলে কল চার্জ কমবে এবং ভালই হবে। কিন্তু আসলে এই কলচার্জ কমিয়ে দেওয়ায় লাভজনক এলাকায় বেসরকারি টেলিকোম্পানিগুলির নেটওয়ার্ক প্রসারিত হবে, তাদের মুনাফা বাড়বে। অন্যদিকে, কেন্দ্র যদি অর্থবরাদ্দ না করে — যা না করাই এখন তাদের নীতি — তাহলে গ্রামীণ টেলিপরিষেবা মার খাবে। টেলিযোগাযোগের প্রযুক্তিগত বিপুল উন্নতির সুফল পাবে ২৭ শতাংশ শহরবাসী এবং ৭৩ শতাংশ গ্রামীণ জনসংখ্যার মধ্যেকার আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন মুষ্টিমেয় নাগরিক। ১০০ কোটি মানুষের এই দেশে এখন টেলিফোন ব্যবহার করেন মাত্র সাড়ে ১৭ কোটি মানুষ। এডিসি উঠে গেলে এদের সুবিধা বাড়বে। ৭৩ শতাংশ গ্রামবাসীর প্রায় সবটাই বঞ্চিত থাকবে। স্বাধীনতার ৫৭ বছর পরও স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ, সড়ক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের মধ্যে রয়েছে বিরাট বৈষম্য এবং তা প্রতিদিন বাড়ছে। মানববিদ্যার প্রাতিষ্ঠানিক পণ্ডিতেরাও ''উন্নয়নের'' মধ্যে শহরমুখী ঝোঁকের কথা এখন বলেন। গভীরে দেখলে বোঝা কঠিন নয় যে, আসলে ঝোঁকটা শহরমুখী নয়, ঝোঁকটা মুনাফামুখী এবং এটাই পুঁজিবাদের নিয়ম। কেন্দ্র পুঁজিবাদের নিয়ম ধরেই একচেটিয়া মালিকদের মুনাফার স্বার্থে সুদের হার কমিয়ে রাখছে যাতে তারা কম সুদে মূলধনের যোগান পায় এবং সুদ বাবদ কম খরচের সুযোগে মুনাফা বাড়াতে পারে। একচেটিয়া টেলি-কোম্পানিগুলির জন্য তারা বাড়তি মুনাফার রাস্তা করে দিচ্ছে।

তাছাড়া চলছে কর কমাবার তোড়জোড়। প্রচলিত সেলস ট্যাক্স ব্যবস্থার আমূল বদল ঘটিয়ে ২০০৫ সালের এপ্রিল থেকে যুক্তমূল্যভিত্তিক কর (ভ্যালু-অ্যাডেড ট্যাক্স বা ভ্যাট) চালু করার আশ্বাস শুধু কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে না, রাজ্যের সিপিএম ফ্রন্ট সরকারও এই আশ্বাস দিচ্ছে এবং বড় ব্যবসায়ীদের বলছে, এতে তারা খুশি হবে। এই ট্যাক্স আরোপ ও আদায়ের পুরো পরিকল্পনা এখনও প্রকাশিত না হলেও এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, এর ফলে বৃহৎ শিল্পপতি, বৃহৎ ব্যবসায়ীরা লাভবান হবে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দোকানদাররা ক্ষতির মুখে পড়বে। তাই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সংগঠন ভ্যাট প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই এ-রাজ্যে ব্যবসা বন্ধ করেছে এবং আগামী দিনে আরও করবে।

শুরুতে সিপিএম ভ্যাট চালুর ব্যাপারে কিছুটা দোনামোনা করেছিল। কারণ, তারা বলেছিল, ভ্যাট চালু হলে বিক্রয়কর বাবদ রাজ্যের আয় কমে যাবে। কিন্তু আপাতত কয়েক বছর ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে — কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রস্তাব দেওয়া মাত্র তারা রাজি হয়েছে। সিপিএমের শাসন-আমলে জনগণের অভিজ্ঞতা হল, যার দ্বারা বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থপূরণ হয় — তাতে রাজ্যের এখন ''না'' নেই; কারণ সিপিএম ফ্রন্ট সরকার একচেটিয়া পুঁজি ও বৃহৎ ব্যবসায়ীদের সরকার, জনগণের নয়। প্রশ্ন উঠবে, ক্ষতিপূরণের বছরগুলি পার হওয়ার পর কী হবে? রাজ্যের আয় তো আরও কমে যাবে! এই সমস্যা সামলাবার জন্য সিপিএম কংগ্রেসের দেখানো ন্যক্কারজনক রাস্তাই নিয়েছে। তা হল একদিকে তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাট, পরিবহন প্রভৃতি ক্ষেত্র বেসরকারি পুঁজির হাতে তুলে দিয়ে সরকারের খরচ কমাবে; অন্যদিকে, সরকারি হাসপাতালে চার্জ বাড়িয়ে, সরকারি পরিবহনে ভাড়া বাড়িয়ে, বা বেসরকারি মালিকদের কাছে বেচে দিয়ে, সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফি বাড়িয়ে, ক্যাপিটেশন ফি চালু করে — অর্থাৎ সিপিএম ফ্রন্ট সরকার নিজে পুঁজিপতির ভূমিকা নিয়ে — শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য পরিষেবার ব্যবসা করে মুনাফা তুলবে। এইভাবে কংগ্রেসের চালু করা উদারনীতি ও বেসরকারীকরণের রাস্তাতেই তারা চলবে। এটাই তাদের সিদ্ধান্ত, যা মুখে না বললেও তাদের কাজ থেকে স্পষ্ট বেরিয়ে আসে। এজন্যই তারা শুধু একচেটিয়া মালিকস্বার্থে গৃহীত কেন্দ্রীয় নীতিকে ভেতরে ভেতরে সমর্থনই করছে না, বাইরে তাদের লোকদেখানো মৌখিক প্রতিবাদও দিনে দিনে ক্ষীণ ও দুর্বল হচ্ছে। মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় কংগ্রেসের

আটের পাতায় দেখুন

কলকাতায় পরিচারিকাদের সমাবেশ

এতদিন যাঁদের হয়ে বলার কেউ ছিলনা ; পেটের দায়ে গৃহ-পরিচারিকা হিসাবে অপরের গৃহে গৃহকর্ম করতে গিয়ে, অথবা শ্রমজীবী মহিলা হিসাবে ভোর থেকে ফুল বা সামান্য ছোটখাট পণ্য সংগ্রহ করে সাতসকালে শহরে এসে সামান্য ব্যবসায় সারা দিন খাটতে গিয়ে নিজের ঘরের পানে ফিরে দেখার সময় যাঁদের হয় না, যাঁদের জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী চার দেওয়ালের গণ্ডিতেই মাথা কুটে মরে — আজ তাঁরা রাজপথে। তাঁদের অব্যক্ত বেদনাকে ভাষা দিয়েছে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছে শ্রমিক সংগঠন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণি।

২১ ডিসেম্বর পরিচারিকাদের কর্মসূচি ছিল বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ ও মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়ার। পূর্বাহ্নেই সবরকম অনুমতি ব্যবস্থা করা, সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি দাবিতে আহূত এই জনসভায় বক্তব্য রাখেন ইউ টি ইউ সি-এল এস-এর রাজ্য সহ-সম্পাদক, বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য এবং রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড লিলি পাল।

সভার প্রধান বক্তা কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনায় তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেন, অসহায়-শোষিত-বঞ্চিত পরিচারিকারাও দেশের শ্রমিকশ্রেণীর অংশ। সুতরাং শ্রমিকশ্রেণীর একজন হিসাবে নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে তাঁদের সচেতন হতে হবে। নিজেদের অধিকার অর্জনের জন্য দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ইউ টি ইউ সি-এল এস সর্বদা তাঁদের পাশে থাকবে।

(ইনসেটে) পরিচারিকাদের সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন ইউ টি ইউ সি- এল এস-এর রাজ্য সহ-সম্পাদক, বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

কমরেড রণজিৎ জানা লাল সেলাম !

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের দিগম্বরপুর অঞ্চলের এস ইউ সি আই-এর বিশিষ্ট কর্মী, এলাকার চাষী আন্দোলনের নেতা কমরেড রণজিৎ জানা (৫৯) দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে গত ২১ নভেম্বর দুপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি ১৯৭৪ সালে এস ইউ সি আই দলের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন এবং এলাকায় দলের আদর্শে গরিব চাষী, খেতমজুর ও ভাগচাষীদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সামাজিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও তিনি ছিলেন একজন অগ্রণী সংগঠক। মথুরাপুর অঞ্চলের নন্দকুমারপুর ও দিগম্বরপুর খেয়া পারাপারের দুই ঘাটে জেটি নির্মাণ করার জন্য সরকারি সাহায্য না পেয়ে, জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ তুলে সেটি নির্মাণ করা হয়। এ কাজে এবং নাট্যদল তৈরি করে জনসংযোগের ক্ষেত্রে কমরেড রণজিৎ জানা বিরাট ভূমিকা পালন করেন। সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের জনবিরোধী ভাষা শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ভাড়াবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়ে তিনি বর্বর পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। সংগ্রামী ভূমিকা ও অমায়িক ব্যবহার তাঁকে সর্বস্তরের মানুষের আপনজন করেছিল।

গত ৮ ডিসেম্বর দিগম্বরপুর ৮ নং ঘেরি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। দলের জেলা কমিটির পক্ষে কমরেড ফণিভূষণ গুছাইত প্রয়াত কমরেডের সংগ্রামী জীবনের নানা দিক উল্লেখ করে, তাঁর অপূরিত স্বপ্ন সার্থক করার আহ্বান জানান। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শ্রী রবীন্দ্র বেরা ও শ্রী সুভাষ মাইতি। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কমরেড্স সহদেব জানা, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোড়ই ও প্রবোধ জানা।

কমরেড গৌরহরি নস্কর লাল সেলাম !

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর থানার ময়দা অঞ্চলের পার্টিকর্মী কমরেড গৌরহরি নস্কর (৫২) রাজস্থানে বেড়াতে গিয়ে মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালে দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। চিকিৎসকদের সবরকম চেষ্টা সত্ত্বেও কমরেড নস্কর গত ২৮ নভেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কমরেড নস্কর আটের দশকে এস ইউ সি আই-এর সংগ্রামী ভূমিকায় আকৃষ্ট হয়ে দলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। সাংসারিকনানা অসুবিধা সত্ত্বেও দলের কাজকে সবসময়ই তিনি অগ্রাধিকার দিয়ে গেছেন। দলের ঐক্য সংহতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে তিনি দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। সমালোচনাকে তিনি হাসিমুখে নিয়ে নিজের কর্তব্য পালন করতেন। তাঁর এই গুণাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ১৯ ডিসেম্বর ময়দা বটতলা প্রাইমারি স্কুল মাঠে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। পার্টি এবং গণসংগঠন ডি এস ও, ডি ওয়াই ও, এম এস এস, কে কে এম এস, শ্রমিক সংগঠন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণি সহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষ থেকে কমরেড নস্করের ছবিতে মাল্যদান করা হয়। স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকায়েত, কমরেড রূপম চৌধুরী এবং স্থানীয় সংগঠক কমরেড গোপেশ্বর নস্কর। সভাপতি ছিলেন প্রবীণ পার্টি কর্মী কমরেড কামরুদ্দি লস্কর। কমরেড নস্করের মৃত্যুতে পার্টি একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মীকে হারাল।

নেওয়া ছিল রানি রাসমণি রোডে সভা করার। কিন্তু শেষমুহূর্তে আই এন টি ইউ সি-কে সেখানে সভা করার অনুমতি দেয় পুলিশ। কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আই এন টি ইউ সি যে রাজ্য সরকারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাই বাতিল হয়ে যায় পরিচারিকাদের আগে দেওয়া সভার অনুমতি। এজন্য বিভিন্ন জেলা থেকে এসে পরিচারিকারা দারুণ হয়রানির মধ্যে পড়েন এবং বোঝেন, শাসকদলগুলির ওপরতলার বোঝাপড়ার তাঁরা শিকার। তবুও তাঁরা দমেননি, সোচ্চারে বলেছেন তাঁদের দাবি, মেট্রো স্টেশনের সামনে জমা হয়ে। পথচলতি মানুষ শুনেছে তাঁদের কথা, এঁদের বেদনা শ্রোতাদের মন ছুঁয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সময় নেই এঁদের কথা শোনার। পুঁজির মালিকদের তোয়াজেই তাঁর দিন কাটে। তাই পুলিশ বলে, স্মারকলিপি দিতে হবে পুলিশের হাতে। ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন পরিচারিকারা, ধিক্কার জানিয়েছেন।

চার সহস্রাধিক পরিচারিকার এই সভায় বক্তব্য রাখেন পরিচারিকা সমিতির সভানেত্রী পার্বতী পাল, সম্পাদিকা পুষ্প পাল এবং অন্যতম সংগঠক রুণু বোস। স্মারকলিপি পাঠ করেন রাধা মিত্র। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত পূজা প্রামাণিক, ঝর্ণা বিশ্বাস, উষা দে, উষা হালদার, মাজিদা বিবি প্রমুখ সভায় বক্তব্য রাখেন।

পরিচারিকাদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি, ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা, ন্যূনতম বেতন আইনের আওতাভুক্ত করা, সাপ্তাহিক একদিনের ছুটি ঘোষণা, বি পি এল কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যবীমা ও বার্ধক্যভাতা চালু করা, সহজেই রেলের স্বল্পমূল্যের মাসিক টিকিট পাওয়ার

সরকার কি সত্যিই অনলাইন লটারির বিরুদ্ধে

একের পাতার পর

রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসীমবাবু বিধানসভায় ঘোষণা করেছেন, 'অনলাইন লটারি বন্ধ করতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর।' অসীমবাবুর এই ঘোষণা কি সত্যই আন্তরিক? যদি তা হত, তবে তাঁরা অনলাইন লটারির ওপর সরকারি কর ধার্য করে তাকে বৈধতার ছাড়পত্র দিচ্ছেন কেন ? অনলাইন লটারি থেকে রাজ্য সরকার বিক্রয়কর, আয়কর এবং প্রমোদকর বাবদ গত আর্থিক বছরে ৮ কোটি টাকা আদায় করেছে। অসীমবাবু বলেছেন, অনলাইন লটারি ব্যাপকভাবে সমাজের ক্ষতি করছে, তাই তাঁরা এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন। অনলাইন লটারির রমরমা বেশ কয়েক বছর ধরেই চলছে, বহুদিন ধরে আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটছে। প্রশ্ন ওঠে, তাঁরা আগেই এই ব্যবস্থা নেননি কেন? অনলাইন লটারির সামাজিক ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে তাঁরা সত্যই কি উদ্বিগ্ন এবং সত্যই কি তাঁদের উদ্দেশ্য অনলাইন লটারি বন্ধ করা ? আদৌ নয়। প্রথমদিন অভিযান চালানোর পর পুলিশ কর্তারা জানিয়েছিলেন, 'যাঁরা অনলাইন লটারি চালাচ্ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ যে কাগজ দেখিয়েছেন, তার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। যাঁরা কাগজ দেখাতে পারেননি, তাঁদের অবিলম্বে তা সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে।' অর্থাৎ 'বৈধ কাগজপত্র' থাকলে সেই লটারি সেন্টারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। অর্থমন্ত্রী এই আসল কথাটি গোপন করলেও তা ফাঁস হয়ে গেছে গণশক্তিতে। ২৩ ডিসেম্বর গণশক্তিতে বলা হয়েছে, '১৯৯৮ সালের লটারি (নিয়ন্ত্রণ) আইনের ৪ নম্বর ধারার শর্ত পূরণ না করলেই ঐ সব কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হবে।' কী আছে ঐ ৪ নম্বর ধারায়? ঐ ধারার ১১ নং শর্তে রয়েছে মূলত লটারির সরকারি অনুমোদনের বিষয়টি, যে অনুমোদন না নিলে রাজ্য সরকার ট্যাক্স থেকে বঞ্চিত হবে। তাই অর্থমন্ত্রী বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় লটারি (নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুযায়ী অনলাইন লটারিগুলি ১১টি শর্ত মেনে চলছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে অর্থদপ্তর ও পুলিশকে বলা হয়েছে।' (গণশক্তি, ২৩/১২)। অর্থাৎ, অনলাইন সেন্টারগুলি যদি আইন মেনে চলে এবং সরকারকে ট্যাক্স দিয়ে চালায় তবে তাতে আর কোন সামাজিক ক্ষতি হবে না — সরকারের ভূমিকা থেকে এই সিদ্ধান্ত করা ছাড়া উপায় থাকে না। অসীমবাবুদের কী অদ্ভুত বিশ্লেষণ ! আসলে সামাজিক ক্ষতির ব্যাপারটি তাঁদের কাছে গৌণ। তাই দেখা গেল, শাসক দলের যুব সংগঠন যখন হঠাৎ অনলাইন লটারির বিরুদ্ধে রণং দেহি রূপ ধারণ করছে তখন সিপিআই(এম) তার দলীয় মুখপত্র গণশক্তিতে দিনের পর দিন বিজ্ঞাপন দিয়ে এই অনলাইন নামক জুয়ার ব্যবসাকে ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। সে বিজ্ঞাপন এমনকী শালীনতার সীমাটুকুও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এ কি দ্বিচারিতা নয়? সিপিএমের যুব সংগঠনের সৎ কর্মী-সমর্থক যাঁরা অনলাইন লটারির বিরুদ্ধে যথার্থই একটা আন্দোলন চান, তাঁদের সাথে এটা কি প্রতারণা নয়? বাস্তবে সিপিএম বা তাদের পরিচালিত ফ্রন্ট সরকার এখন আর নীতিগতভাবে অনলাইন লটারি সহ নানা ধরনের জুয়া বা মাদকের প্রসার, নোংরা সিনেমা বা অশ্লীল পত্রপত্রিকার রমরমা — কোন কিছুরই বিরোধী নয়। বরং মালিকশ্রেণীর সেবায়েত হিসাবে তারা চায় এগুলির প্রসার ঘটুক। তাতে শুধুমাত্র রাজস্ব বাড়বে তাই নয়, ক্রমবর্ধমান বেকারি, ছাঁটাই, মূল্যবৃদ্ধির চাপে জর্জরিত সাধারণ মানুষ তথা যুবসমাজের, শোষণমূলক বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ সংগঠিত আন্দোলনের আকারে ফেটে পড়তে পারবে না, তাদের নীতিবোধ, মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যাবে, শুভবুদ্ধি গুলিয়ে যাবে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রাজ্য সরকার হাজার হাজার মদের দোকানের লাইসেন্স দিয়ে চলেছে। অথচ সমাজে মদের মারাত্মক কুফল সম্পর্কে কে না জানে! লটারি, জুয়া, মদের প্রসার — এগুলি যেমন সাধারণ মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে নিঃস্ব করে, তেমনি এগুলির প্রতি আসক্তি মানুষের জীবন সম্পর্কে আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দেয়, চরিত্রের দৃঢ়তাকে নষ্ট করে, রুচি-সংস্কৃতির মান নামিয়ে দেয়। আর রুচি-সংস্কৃতি বর্জিত চরিত্রহীন মানুষ কখনও শাসকশ্রেণীর অত্যাচারের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারে না।

সুতরাং অনলাইন লটারি নিয়ে রাজ্য সরকারের পুলিশি তৎপরতায় বিভ্রান্ত না হয়ে এই সর্বনাশা জুয়ার আইনি স্বীকৃতি বাতিলের দাবিতে ব্যাপক যুব আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তাতে সামিল করতে হবে সর্বস্তরের যুবক সহ সাধারণ মানুষকে। তার মধ্য দিয়েই সরকারকে বাধ্য করতে হবে দাবি মানতে।

সি পি এম-এর প্রস্তাবে বন্‌ধ শব্দটিও নেই

একের পাতার পর

ডিসেম্বর গরিষ্ঠতার জোরে সি পি এম বিধানসভায় এস ইউ সি আই-এর উত্থাপিত প্রস্তাব খারিজ করে দিয়ে তাদের আনা প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেয়। জনসাধারণের অবগতির জন্য এখানে দু'টি প্রস্তাবই প্রকাশ করা হল।

বিধানসভায় সি পি এম-এর প্রস্তাব

''এই সভা লক্ষ্য করছে যে, ধর্মঘটকে একটি অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার জনগণের ও শ্রমিকদের যে জন্মগত অধিকার, তাকে সাম্প্রতিককালে খাটো এবং/অথবা খর্ব করার চেষ্টা চলছে।

এই সভা আরও লক্ষ্য করছে যে, ভারতের মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিদের গুরুত্বপূর্ণ রায় মোতাবেক ভারতের সংবিধানের ১৯, ২১, ৫১ ও ৫১ ক ধারায় মীমাংসিত নীতিগুলিকে বিবেচনা না করেই কিছু কিছু মহল থেকে প্রায়ই বলা হচ্ছে, ধর্মঘটের অধিকার মৌলিক অধিকার নয়, বিধিসম্মত নয়, যুক্তিযুক্ত/নৈতিকও নয়।

এই সভা, গজেন্দ্র গদকার, চাগলা ও চেন্নাপ্পা রেড্ডির মতো সুবিখ্যাত প্রধান বিচারপতিদের বক্তব্য সম্পর্কে অবগত আছে, এঁরা লর্ড ডেনিঙ্গের অভিমতের উপর আস্থাশীল হয়ে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন যে, ধর্মঘটের অধিকার গত ১০০ বছর ধরেই শ্রমিকদের জন্মগত অধিকার রূপে রয়েছে এবং কোনও ধর্মঘটের ক্ষেত্রেই অবৈধ অথবা বেআইনি বলে কিছু থাকতে পারে না।

এই সভা আরও অবগত আছে যে, ভারতীয় সংবিধানের ১৯ ও ২১নং ধারা মোতাবেক, দেশের আইন লঙ্ঘন না করে ধর্মঘট করার অধিকার বিক্ষুব্ধ জনগণের আছে।

এই সভা এও জানে যে, স্বাধীনতার জন্য আমাদের জাতীয় সংগ্রামে, একটি অস্ত্র হিসাবে ধর্মঘটকে নেতারা ব্যবহার করেছেন।

এই সভার অভিমত হচ্ছে, পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সংগ্রামে শ্রমিকদের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র হল ধর্মঘট।

এই সভা তাই কেন্দ্রীয় সরকার যাতে প্রয়োজনীয় কার্যকরী পদক্ষেপ নেয় এবং আইন অনুযায়ী ধর্মঘটসহ যে সকল অধিকার ও সুবিধা শ্রমিকরা ও জনগণ অর্জন করেছে, তা কোনওভাবেই খাটো এবং/অথবা খর্ব করা না হয় সে ব্যাপারে উদ্যোগী হতে রাজ্য সরকারকে আবেদন জানাচ্ছে।''

এস ইউ সি আই-এর প্রস্তাব

''এই সভা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে —

সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকারগুলির অবাধ ব্যবহার প্রবল আক্রমণের সম্মুখীন।

কিছু মহলের বক্তব্যে ধর্মঘট ডাকার অধিকারকে পৃথক করা হয়েছে বন্‌ধ ডাকার অধিকার থেকে।

বন্‌ধকে নিষিদ্ধ করার চেষ্টা চলছে এই অনুমানভিত্তিক ব্যাখ্যার ভিত্তিতে যে, বন্‌ধ মানেই হিংসা, হুমকি, ভীতিপ্রদর্শন, জবরদস্তি এবং যে ব্যক্তি বন্‌ধ সমর্থন করেন না এবং স্বাভাবিক কাজকর্মে যোগ দিতে চান, তাঁর অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ, যেগুলি জেনারেল স্ট্রাইকের ক্ষেত্রে হয় না ; মন্তব্য করা হয়েছে, বন্‌ধ অসাংবিধানিক এবং তা ব্যক্তির মৌলিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ।

এই সভা মনে করে যে, উপরোক্ত ব্যাখ্যার বিপরীতে বাস্তবে সাধারণ ধর্মঘট ও বন্‌ধের মধ্যে গুণগত কোনও পার্থক্য নেই এবং পূর্বে যাকে সাধারণ ধর্মঘট বলা হত, সেটাই পরবর্তীকালে বন্‌ধ নামে জনপরিচিতি লাভ করেছে এবং উভয়ের মধ্যে নামগত পার্থক্য ছাড়া চরিত্র ও কর্মগত কোনও পার্থক্য নেই।

এই সভা আরও মনে করে যে, যেকোন বন্‌ধ মানেই হিংসা, জবরদস্তি, মানসিক চাপ সৃষ্টি হওয়ার যুক্তি সঠিক নয় এবং এ ব্যাপারে বাস্তব নজির হিসাবে রয়েছে এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেই জনগণের দ্বারা শান্তিপূর্ণ, স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বেচ্ছায় বন্‌ধ পালন করার বহু ঘটনা।

এই সভা গভীর উদ্বেগের সাথে এও লক্ষ্য করছে যে —

যে ধর্মঘট শ্রমিকদের বেঁচে থাকার সংগ্রামে একটি মূল হাতিয়ার ও তাদের একটি অবিচ্ছেদ্য অধিকার, তার ব্যবহারের উপর অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ ঘটছে।

এই সভা আরও মনে করে যে, এই সমস্ত প্রয়াস, যেকোন মহল থেকেই করা হোক না কেন, তা আমাদের দেশের আইন ও সংবিধানের বিরুদ্ধেই যায় এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল শর্তগুলিরও তা বিরোধী। রাজনৈতিক দলগুলির অব্যাহত কার্যকলাপ ও ব্যক্তির সকল সাংবিধানিক ও জন্মগত অধিকারগুলি, যার মধ্যে প্রতিবাদ করার, ধর্মঘট করার ও বন্‌ধ ডাকার অধিকার অবশ্যই রয়েছে — তার অবাধ ব্যবহারকে সংসদীয় গণতন্ত্র নীতিগতভাবেই সুনিশ্চিত করে।

এই সভা, কেন্দ্রীয় সরকার যাতে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যকরী পদক্ষেপ নেয় এবং সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকারগুলির অবাধ ব্যবহার যেন কোনভাবেই বাধাগ্রস্ত না হয়, সেজন্য রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে উদ্যোগী হতে আবেদন জানাচ্ছে ''

দুটি প্রস্তাবকেই বিধানসভায় আলোচনার জন্য পেশ করা হয়। নিজের পেশ করা প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এস ইউ সি আই পরিষদীয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, সি পি এমের রবীন দেব আনীত প্রস্তাব বিষয়ে বলেন, পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার জন্যই রবীনবাবু শুধু ধর্মঘটের অধিকারের কথা বলেছেন। বন্‌ধ বিষয়ে তিনি কিছু বলেননি। আসলে সি পি এম কেন্দ্রের সমস্ত রকম জনবিরোধী কাজ সমর্থন করে আসছে, আর মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এখানে বিরোধিতার ভান করছে।

সোভিয়েট ব্যবস্থার তিনটি স্তম্ভ

চারের পাতার পর

অনুযায়ী ''নাগরিকদের এই অধিকারগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য শ্রমজীবী জনসাধারণ ও তাদের সংগঠনগুলির হেফাজতে ছাপাখানা, কাগজের সরবরাহ, সভাগৃহ, রাস্তা, যোগাযোগ মাধ্যম এবং অধিকারগুলি ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণ তুলে দেওয়া হবে।

৫। কাজের অধিকার — প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের জন্য এমন কাজ প্রদান করা যাতে সে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারে এবং শিল্প, কৃষি বা মৎস্যচাষ বা যে কোন ক্ষেত্রে সমবায় উৎপাদন সমিতিতে তার যোগদানের সুযোগ থাকে।

৬। বিশ্রামের অধিকার — অফিস, কারখানা বা খনিতে শ্রম- সময় উপযুক্তভাবে কমিয়ে আনা হবে; সবেতন ছুটি প্রদান করা এবং সেই ছুটি অনুমোদিত পদ্ধতিতে আনন্দের সঙ্গে ব্যবহারের উপযুক্ত ব্যবস্থাদি প্রদান করা।

৭। যৌথ মালিকানার অধিকার — ট্রেড ইউনিয়ন ও সোভ্‌নারকম (মন্ত্রীসভা) কর্তৃক বার্ষিক হিসাবের ভিত্তিতে স্থিরীকৃত সোভিয়েট ইউনিয়নে শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সমস্ত সম্পদের উপর, মজুরি বা বেতন- ভোগী শ্রমিক-কর্মচারী ও তাদের অক্ষম নির্ভরশীল পরিবার সদস্যদের যৌথ অধিকার।

৮। শারীরিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্যের অধিকার — বিনাপয়সায় রোগ প্রতিরোধক ও আরোগ্যমূলক চিকিৎসা এবং শল্যচিকিৎসা ও গণপ্রয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা। অসুস্থতা বা অক্ষমতার ক্ষেত্রে ''মেয়াদী অপেক্ষা'' ছাড়াই, অর্থাৎ পরদিন থেকেই ঊর্ধ্বসীমা ছাড়াই বেতন প্রদান। এবং সমস্ত নবজাতক, শিশু ও কিশোরদের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি ও শারীরিক প্রশিক্ষণ সুনিশ্চিত করা।

৯। নারীদের যথাসম্ভব শারীরিক ক্লেশ নিবারণ করে কোন আর্থিক ক্ষতি বা বোঝা ব্যতিরেকে মাতৃত্বের দায়িত্ব পালনের অধিকার; এবং পাশাপাশি নবজাতক ও শিশুদের পরিচর্যার সর্বাঙ্গীণ সুসংগঠিত বন্দোবস্ত।

১০। উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যুতে তার পরিবারের জন্য দ্রুত ও পর্যাপ্ত ভরণপোষণের ব্যবস্থার অধিকার; মৃতের উপযুক্ত সৎকার এবং পরিবারের বাসস্থানের জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা।

২২। বার্ধক্য-জরার আগে বা স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণে অবসর গ্রহণের অধিকার।

১২। সকল জাতির জন্য সমভাবে, সীমাহীনভাবে, বিনা পয়সায় শিক্ষার অধিকার; নারীপুরুষ নির্বিশেষে যেকোন ব্যক্তির যেকোন বয়সে এই অধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিপোষণ।

রাজনৈতিক সদিচ্ছা হিসাবে ঘরে-বাইরে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে গোপনে গোপনে কূটনৈতিক মহল একে মহান বলে মেনে নিচ্ছে। দূতাবাসগুলির ভদ্র সদস্যদের মধ্যে সবচেয়ে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত যারা তাদেরও 'বলশেভিকবাদ হয়ত টিকবে না' — এই বদ্ধমূল ধারণায় চিড় না ধরে পারছে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্ররা সংবিধান সংক্রান্ত অধ্যায়ে এক সম্পূর্ণ নতুন উদাহরণ সংযোজন করছে। কিন্তু এটা ঠিক যে, শেষ অবধি সংবিধানে কী লেখা আছে তা দিয়ে তার বিচার হয় না। এই বিচারটা হয় কীভাবে তা কার্যকর হচ্ছে বা কার্যকর করা হচ্ছে — তা দিয়ে। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রবর্তিত সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সংবিধানে লিখিত ''বারোটি অধিকারের সারণী''-র দুনিয়ার কাছে বিচার হবে আজ থেকে পাঁচ বছর পরের অভিজ্ঞতায়, যদি যুদ্ধ না হয়। ধরা যাক ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে, তখন এই অধিকারগুলি কীভাবে ফলপ্রসূ হচ্ছে তা দেখে। আমরা বর্তমানে শুধু বলতে পারি, অধিকাংশ ব্রিটিশ ও আমেরিকানদের কাছে এটা সঠিক অভিমুখে পদক্ষেপ বলে মনে হচ্ছে। (ক্রমশ)

নলহাটী

বিডিও অফিসে ডেপুটেশন

এস ইউ সি আই নলহাটী লোকাল কমিটির উদ্যোগে ৯ ডিসেম্বর ১০ দফা দাবিতে তিন শতাধিক নারীপুরুষ বিডিও অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সেখানে এক সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড আব্দুল সালাম, মজিবর রহমান এবং মাসাদুল ইসলাম।

এই বিক্ষোভ সভা থেকে পাঁচজনের এক প্রতিনিধি দল বিডিও'র কাছে ডেপুটেশন দেন। অতিবৃষ্টিজনিত বন্যায় নলহাটি ব্লকের ১০টি গ্রামপঞ্চায়েতের ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের ক্ষতিপূরণ সহ বিনামূল্যে সার ও বীজ সরবরাহ করা, বেআইনি খাদানগুলি বন্ধ করা এবং দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত শ্রমিকদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া, হরিদাসপুর অঞ্চলের আলমপুরের সাঁওতাল পরিবারের জমি ফেরত দেওয়া এবং নলহাটী পূর্ববাজার থেকে পশ্চিম বাজারে যাওয়ার মাঝে লেভেলক্রশিং-এ সাবওয়ে নির্মাণের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

মেডিকেল এন আর আই ছাত্রসমস্যা

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অসত্য

মেডিকেলে এন আর আই কোটায় ছাত্রদের বেআইনি ভর্তির বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২১ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এন আর আই ছাত্রদের ভর্তি আইন ও পদ্ধতি মেনেই করা হয়েছে। এই বক্তব্য সম্পূর্ণ অসত্য, এর দ্বারা মুখ্যমন্ত্রী ঐ ছাত্রদের ও জনগণকে আবারও বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। প্রকৃত ঘটনা নিম্নরূপ ঃ

১। সরকার ভালভাবেই জানত কোনও সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ম্যানেজমেন্ট কোটার কোন বিধান নেই। জয়েন্ট এন্ট্রান্স-এর বাইরে কোন পরীক্ষাও নেই।

২। ২০০২ সালে রাজ্য সরকার ৭টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ১৫ শতাংশ আসনে ১৮ লক্ষ টাকা ক্যাপিটেশন ফি-র বিনিময়ে ছাত্র ভর্তির সিদ্ধান্ত নিয়েও আন্দোলনের চাপে তা বাতিল করতে বাধ্য হয়।

৩। ২০০৩ সালে জয়েন্ট পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর ১১ আগস্ট কাউন্সেলিং-এর দিন সরকার ঠিক করে ৭টি কলেজের প্রতিটিতে মোট ৭০টি আসন এন আর আই-দের জন্য কেটে রাখা হবে। ছাত্র-অভিভাবকদের আন্দোলন হয়। হাইকোর্টে সরকার পরাস্ত হয়। ৭০টি আসনেও জয়েন্ট পাশ ছাত্রদের ভর্তি করতে সরকার বাধ্য হয়।

৪। ২০০৩ সালে জয়েন্টের বাইরে সরকার শুধু এন আর আই-দের জন্য 'ম্যানেজমেন্ট কোটায়' ভর্তির নামে বেআইনিভাবে ১৭ আগস্ট একটি পরীক্ষা নেয়। কোনও আসন না থাকা সত্ত্বেও ঐ বেআইনি পরীক্ষায় 'সফল' ১৫০ জন ছাত্রের তালিকা প্রকাশ করে, ভর্তির কাউন্সেলিংও সেরে ফেলে। তীব্র প্রতিবাদ হয়। হাইকোর্ট এদের ভর্তি করা যাবে না বলে স্থগিতাদেশ দেয়।

৫। ২০০৪ সালে এস এস কে এম ও মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের অনুমোদন পেলে সেখানে এন আর আই কোটায় ছাত্র ভর্তি করবে না বলে সরকার সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে বলেছিল। অথচ অনুমোদন পেতেই সেটাই তারা করেছে। অর্থাৎ, সুপ্রিম কোর্টে সরকার মিথ্যা বলেছিল।

সরকারের এই প্রতারণামূলক ভূমিকাকে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি। বাতিল হওয়া এন আর আই ছাত্রদের টাকা ফেরৎ দেওয়ার এবং তাঁদের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

অনলাইন লটারি

ডি ওয়াই ও'র মিছিল, বিক্ষোভে পুলিশের লাঠিচার্জ

অবিলম্বে অনলাইন লটারি নিষিদ্ধ করার দাবিতে ২০ ডিসেম্বর ডি ওয়াই ও'র উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক হাজার যুবক-যুবতী উপস্থিত হন কলেজ স্কোয়ার বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষিত যুবক-যুবতী থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের বেকার যুবক, চা-বাগানে কাজ করা যুবক, শহরের রাস্তায় হকারি করা, মোটর গ্যারেজে কাজ করা যুবক, কৃষক পরিবারের বেকার যুব সহ সমাজের সর্বস্তরের যুব প্রতিনিধি। মিছিলে আসা হকার যুবক রঞ্জন দাস নিজেই ছিলেন অনলাইন লটারিতে আসক্ত। এ আই ডি ওয়াই ও'র সংস্পর্শে এসে সে নেশা ত্যাগ করে তিনি আজ যুব আন্দোলনের একজন কর্মী। উত্তরবঙ্গের যুবক রঞ্জিত রাই আগে ছিলেন সরকারি দলের যুব সংগঠনের সমর্থক। ওই সংগঠনের নেতৃত্বের দ্বিচারিতা ধীরে ধীরে তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। এখন তিনি ডি ওয়াই ও'র একজন সংগঠক, এই বিক্ষোভ আন্দোলনে নিয়ে এসেছিলেন এক দল যুবককে। রাজ্যের বিভিন্ন গ্রাম শহর থেকে এসেছিলেন এইরকম অসংখ্য তরতাজা ছেলেমেয়ে।

যুব বিক্ষোভের অপর এক উল্লেখযোগ্য দাবি ছিল, রাজ্য সরকারের মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করা। রাজ্যে ডি ওয়াই ও একমাত্র সংগঠন যারা এই দাবিতে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে আসছে। আন্দোলনের জন্য এলাকায় এলাকায় কনভেনশন করে মাদকবিরোধী, যুব কমিটি, নাগরিক কমিটি গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া স্বনিযুক্তি প্রকল্পের ভাঁওতা বন্ধ করে সকল বেকারের স্থায়ী কাজের দাবিও ছিল বিক্ষোভের অন্যতম দাবি। মিছিল শুরুর আগে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে একটি সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডি ওয়াই ও রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড সুরথ সরকার সহ রাজ্যের ও জেলার নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বক্তারা প্রত্যেকে যুব সমাজকে বিপথে পরিচালিত করতে মদ, জুয়া, সাট্টা, নোংরা সিনেমা ও অশ্লীল পত্র-পত্রিকার প্রসারে রাজ্য সরকারের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেন। কলেজ স্কোয়ার থেকে বিভিন্ন দাবি-ব্যানারে সুসজ্জিত যুব মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে রানি রাসমণি রোডে পৌঁছায়। সেখানেও একটি সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য সম্পাদক কমরেড স্বপন দেবনাথ সহ বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন। কমরেড স্বপন দেবনাথ বলেন, রাজ্যব্যাপী যুব আন্দোলনের ফলেই সরকার বাধ্য হয়েছে অনলাইন সেন্টারগুলির বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান চালাতে। এখন সরকারকে বাধ্য করতে হবে অনলাইন সহ সমস্ত রকম লটারি নিষিদ্ধ করতে। তিনি এ জন্য রাজ্য জুড়ে এলাকায় এলাকায় যুবকদের সংগঠিত করে যুব কমিটি গড়ে তুলে আন্দোলনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

ওই দিনই অনলাইন লটারি নিষিদ্ধ করা ও মদের লাইসেন্স বাতিল করার দাবিতে বিধানসভার সামনে জড়ো হন দুই শতাধিক যুবকর্মী। বিধানসভার অভ্যন্তরে যুবজীবনের এই সমস্যার কথা পৌঁছে দেওয়াই ছিল ডি ওয়াই ও কর্মীদের উদ্দেশ্য। কিন্তু ১৪৪ ধারা ভঙ্গের তুচ্ছ অভিযোগে পুলিশ বিনা প্ররোচনায় যুব কর্মীদের ওপর লাঠিচার্জ শুরু করে। টেনে-হিঁচড়ে তাদের গ্রেপ্তার করে গাড়িতে তোলে। গাড়িতে তোলার সময়েও অমানুষিকভাবে প্রহার করতে থাকলে এক যুবকর্মী বুক চিতিয়ে বলে ওঠেন, কত মারবেন মারুন, তবু আমাদের প্রতিবাদ বন্ধ করতে পারবেন না। সাময়িকভাবে থমকে যায় পুলিশের লাঠি। পুলিশ এক যুবকর্মীকে মারতে মারতে মাটিতে ফেলে বুট দিয়ে লাথি মারতে থাকলে হাইকোর্ট চত্বরে উপস্থিত আইনজীবী, কোর্টকর্মী ও সাধারণ মানুষ প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। তাঁদের তীব্র প্রতিবাদের সামনে পড়ে পুলিশ পিছু হঠতে বাধ্য হয়। পুলিশি নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাননি মহিলা কর্মীরাও। পুলিশি আক্রমণে ৪ জন গুরুতর আহত সহ মোট ১১ জন কর্মী আহত হন। পুলিশ মোট ৪৬ জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করে।

২০ ডিসেম্বর অনলাইন লটারি নিষিদ্ধ করার দাবিতে এস এন ব্যানার্জী রোডে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল। (নিচে) বিধানসভা ভবনের সামনে বিক্ষোভরত ডি ওয়াই ও'র কর্মীদের ওপর পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জ

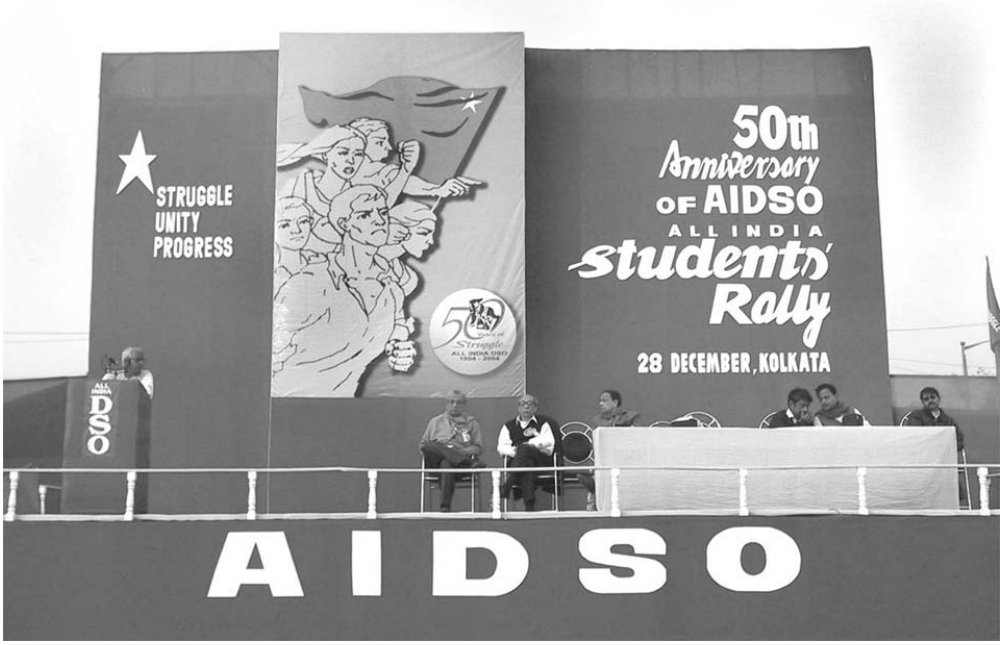

এ আই ডি এস ও'র ৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে বিশাল ছাত্রসমাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। মঞ্চে উপবিষ্ট এ আই ডি এস ও'র প্রাক্তন ও বর্তমান সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ (বিস্তারিত সংবাদ আগামী সংখ্যায়)

তালতলায় নারী পাচার প্রশাসনিক তদন্ত চাই

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৩ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন —

"তালতলায় সিপিএম দলের জনৈক গরিব মহিলা কর্মী ঐ এলাকার দলের একজন প্রভাবশালী নেতার বিরুদ্ধে তাকে বিক্রি করার ষড়যন্ত্র করেছে বলে দলের রাজ্য সম্পাদকের কাছে যে অভিযোগ করেছিলেন, সে সম্পর্কে রাজ্য সম্পাদক 'তদন্ত' করে নেতাকে 'নির্দোষ' এবং মহিলাকে 'দলকে হেয় করার' অভিযোগে বহিষ্কার করেছেন, এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সিপিএম নেতৃত্ব যেভাবে নেতাদের নানা অপকর্ম ও অনৈতিক কাজকে আড়াল করছেন, তাতে এই তথাকথিত তদন্তের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আমরা এই মহিলার অভিযোগের চরিত্র ও গুরুত্ব বিবেচনা করে দলের পরিবর্তে প্রশাসনিক তদন্ত করানোর জন্য সিপিএম রাজ্য সম্পাদককে ১৩-১২-২০০৪ তারিখে এক চিঠিতে অনুরোধ করেছিলাম।

পুনরায় আমরা এই অভিযোগ সম্পর্কে সরকারের কাছে প্রশাসনিক তদন্তের জন্যই আবেদন জানাচ্ছি।"

সিপিএমের আত্মসমর্পণ

পাঁচের পাতার পর

সঙ্গে তাদের আপস প্রকটভাবে বেরিয়ে আসছে।

এই অবস্থায় সমস্ত বামপন্থী কর্মী ও বামপন্থার সমর্থকদের সচেতন হতে হবে যাতে বহু শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী প্রতিবাদী মর্যাদা বর্তমান সিপিএম নেতৃত্ব কলঙ্কিত করতে না পারে। বামপন্থী কর্মীদের বুকের রক্তে যে কংগ্রেসের হাত রক্তাক্ত, সেই কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মালিকশ্রেণীর পদসেবায় নিয়োজিত যারা, তাদের ধিক্কার দিয়ে, নতুনভাবে পুঁজিবাদবিরোধী লক্ষ্য নিয়ে বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তুলে, কী বিজেপি কী কংগ্রেস — উভয়ের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আজ দাঁড়াতে হবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net